# ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার

( ভারতীয় সংস্কৃতির নয়া ব্যাখ্যা )

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড.
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

বাংলা সাহিত্যে হরিদাসবাবুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান হলো "বিনয় সরকারের বৈঠকে" নামক বৃহদাকার গ্রন্থের সংকলন। সে ১৯৪২ সনের কথা। সে সময় থেকে অদ্যাবধি তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্নের সংগে চিন্তানায়ক বিনয় সরকারের মনীষা ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করে চলেছেন ও তাঁর চিন্তাধারার সংগে বহু পাঠকের আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেছেন।

কিছুদিন পূর্বে বিনয় সরকারের সুযোগ্যা সহধর্মিণী এক পত্রে হরিদাসবাবুর সম্পর্কে লিখেছিলেন: "He (Benoy Sarkar) told me and Indira so often, that if ever some one has known me and my message it is Haridas." হরিদাসবাবুর ১৯৫৩ সনে লেখা **Benoy Kumar Sarkar : A Study** বইখানা পড়ার পর আমাদের এ ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে। "ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার" পুস্তকেও গ্রন্থকার বিনয় সরকারের বহুমুখী প্রতিভার ওপর নতুন আলোকসম্পাত করেছেন।

**ত্রিপুরাশঙ্কর সেন**

# ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার

( ভারতীয় সংস্কৃতির নয়া ব্যাখ্যা )

"বিনয় সরকারের বৈঠকে", "বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী", "এ ফেজ অব দি স্বদেশী মুভ্‌মেণ্ট"-প্রণেতা

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্‌

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

১৯৫৮

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক—
শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্ত্তী, এম্. এস্-সি.
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

৭২৭ বিনয়
হরিদাস
(OR)
JADAVPUR UNIVERSITY
Acc. No 1.51.831...
Date 6.2.70... ...
LIBRARY

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
২৫নং ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

স্বর্গত বিনয়কুমার সরকারের সহধর্মিণী
শ্রীযুক্তা ইদা সরকারের উদ্দেশে
গ্রন্থখানি গভীর শ্রদ্ধার সংগে
উৎসর্গীকৃত হলো।

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| | গ্রন্থকারের বিবৃতি | ॥/০—॥৶০ |
| | ভূমিকা—ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত | ৸/০—১৶০ |
| ১। | ঐতিহাসিক গবেষণা কি বস্তু ? ... | ১ |
| ২। | বিনয়কুমারের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী ... | ২ |
| ৩। | ডন সোসাইটীতে ইতিহাস-সাধনা ... | ৪ |
| ৪। | ইতিহাস-বিজ্ঞানের সূত্রাবলী ... | ৭ |
| ৫। | "হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি" ... | ১৪ |
| ৬। | চীনা, জাপানী ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় সমালোচনা | ১৯ |
| ৭। | "যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা" ... | ২৭ |
| ৮। | "হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শন" ... | ৩১ |
| ৯। | বাংলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চা—অনুবাদ-সাহিত্য ... | ৩৬ |
| ১০। | "বর্তমান জগৎ"-বিষয়ক গবেষণা ... | ৪১ |
| ১১। | বিনয়কুমারের চিন্তায় "পাশ্চাত্য" গবেষণার ঠাঁই | ৪৪ |
| ১২। | ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক অনৈক্য ... | ৫০ |
| ১৩। | "নেশ্যন"-রাষ্ট্রের স্বরূপ ... | ৫৩ |
| ১৪। | "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" ... | ৫৬ |
| ১৫। | ঐতিহাসিক গবেষণায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ... | ৫৮ |
| ১৬। | ইতিহাস-চর্চায় "বস্তুনিষ্ঠা"র প্রয়োজনীয়তা ... | ৬২ |
| ১৭। | বাংলার নবজাগরণে প্রাক্-রামমোহন যুগ ... | ৬৭ |
| ১৮। | লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণা ... | ৭৪ |
| ১৯। | বিনয়কুমারের গদ্য-রীতি ... | ৮৪ |
| ২০। | "সংস্কৃতি" ও "সভ্যতা" বিশ্লেষণে বিনয়কুমার ... | ৮৯ |

পরিশিষ্ট

(ক) ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস ও স্বরূপ আলোচনায় বিনয় সরকারের দান—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩-১০৩

(খ) Culture or Creation as Domination—Benoy Kumar Sarkar ... ১০৪-১০৭

---

## THE MESSAGE OF EQUALITY

We are not going to claim for the Asians the credit for initiating all the factors of human progress, or the monopoly of all the great discoveries which have made civilization what it is. We do not claim for the people of Asia, whether historically or psychologically, greater intellectuality or greater spirituality than for the rest of mankind.

Our claims are not so pretentious or absurd. The sole thesis is that the Orientals have served mankind with the same idealism, the same energy, the same practical good sense, and the same strenuousness, as have the Greeks, Romans and Eur-Americans, that the Orientals have been as optimistic, active and aggressive in promoting social well-being and advancing spiritual interests as have the other races, that the Orientals have developed ideas, ideals and institutions which are analogues, if not, in many cases, almost duplicates or replicas of the ideas, ideals and institutions of the rest of humanity, and that superstitious ceremonies and observances have had the same pragmatic significance for the folks of the Christian Occident as of the 'heathen' Orient. Asian culture, again, is not all original creation of indigenous Oriental intellect, but, to a great extent, the result also of conscious adaptation, imitation or assimilation from extra-Asian sources, like other culture-systems of the world. Lastly, the animality or materialism of the

Asians has not been less in intensity or extensity than that of the Europeans and Americans.

In short, the Orientals are men, their successes and failures are the successes and failures of human beings. They should therefore be judged by the same standard by which the tribulations, lapses, weaknesses, falterings, and triumphs of Eur-American humanity are measured. That is, they are to be tried not by an impossible static standard of the ideal conditions in a utopia, but by the dynamic historical standard which suits the conditions of the ever-varying, ever-struggling, ever-failing, ever-succeeding, part-brute, part-god animal called Man. The culture-anthropologist must have to be honest enough to say with Walt Whitman :—

"In all people I see myself,
None more and not one a barley-corn less,
And the good or bad I say of myself
I say of them."

**—Benoy Kumar Sarkar**
(*The Futurism of Young Asia*,
Leipzig 1922, pp. 175-76).

# গ্রন্থকারের বিবৃতি

সে আজ চোদ্দ বছর আগেকার কথা। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস বিভাগে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ( ১৯৪৩ )। ঐ বৎসরের ১লা ডিসেম্বর "Sarkarism and Neo-Indology" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ "হিস্ট্রি সেমিনারে" পাঠ করি। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সতীর্থদের মধ্যে ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅম্লানকুমার দত্তের ( বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং *For Democracy* ও *Soviet Economic Development* পুস্তকদ্বয় প্রণেতা-র ) নাম আজও আমার মনে পড়ে। ঐ প্রবন্ধটি ১৯৪৪ সনে শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত সম্পাদিত *Art and Culture* ত্রৈমাসিকে ( Vol. IV, No. 4 ) প্রথম মুদ্রিত হয় ও পরে পরিবর্তিত অবস্থায় "মডার্ণ রিভিয়ু" মাসিকে ( ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ ) বাহির হয়। উহারই উপর ভিত্তি করে "ঐতিহাসিক বিনয় সরকার" নামে যে প্রবন্ধ রচনা করি, তা শ্রীরণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত "বঙ্গশ্রী" মাসিকে ( মাঘ, ১৩৫৯ ) স্থান লাভ করে। বর্তমান পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয় এই বাংলা রচনার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ মাত্র।

এই পুস্তক রচনার কাজে যাঁদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডক্টর ত্রিগুণানাথ সেন, ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক চণ্ডীকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে আমার সহকর্মী অধ্যাপক জীবনকৃষ্ণ শেঠ, অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক

Asians has not been less in intensity or extensity than that of the Europeans and Americans.

In short, the Orientals are men, their successes and failures are the successes and failures of human beings. They should therefore be judged by the same standard by which the tribulations, lapses, weaknesses, falterings, and triumphs of Eur-American humanity are measured. That is, they are to be tried not by an impossible static standard of the ideal conditions in a utopia, but by the dynamic historical standard which suits the conditions of the ever-varying, ever-struggling, ever-failing, ever-succeeding, part-brute, part-god animal called Man. The culture-anthropologist must have to be honest enough to say with Walt Whitman :—

"In all people I see myself,
None more and not one a barley-corn less,
And the good or bad I say of myself
I say of them."

**—Benoy Kumar Sarkar**
(*The Futurism of Young Asia*,
Leipzig 1922, pp. 175-76).

# গ্রন্থকারের বিবৃতি

সে আজ চোদ্দ বছর আগেকার কথা। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস বিভাগে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র (১৯৪৩)। ঐ বৎসরের ১লা ডিসেম্বর "Sarkarism and Neo-Indology" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ "হিস্‌ট্রি সেমিনারে" পাঠ করি। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সতীর্থদের মধ্যে ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅম্লানকুমার দত্তের (বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং *For Democracy* ও *Soviet Economic Development* পুস্তকদ্বয় প্রণেতা-র) নাম আজও আমার মনে পড়ে। ঐ প্রবন্ধটি ১৯৪৪ সনে শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত সম্পাদিত *Art and Culture* ত্রৈমাসিকে (Vol. IV, No. 4) প্রথম মুদ্রিত হয় ও পরে পরিবর্তিত অবস্থায় "মডার্ণ রিভিয়ু" মাসিকে (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০) বাহির হয়। উহারই উপর ভিত্তি করে "ঐতিহাসিক বিনয় সরকার" নামে যে প্রবন্ধ রচনা করি, তা শ্রীরণজিৎকুমার সেন সম্পাদিত "বঙ্গশ্রী" মাসিকে (মাঘ, ১৩৫৯) স্থান লাভ করে। বর্তমান পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয় এই বাংলা রচনার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ মাত্র।

এই পুস্তক রচনার কাজে যাঁদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডক্টর ত্রিগুণানাথ সেন, ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক চণ্ডীকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে আমার সহকর্মী অধ্যাপক জীবনকৃষ্ণ শেঠ, অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক

নারায়ণচন্দ্র সাহা, অধ্যাপক তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় নানা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে এ পুস্তক রচনার কাজে সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। "আনন্দবাজার পত্রিকা"-সংশ্লিষ্ট শ্রীপুলকেশ দে সরকার, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ও শ্রীমন্মথনাথ সান্ন্যাল, "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু, "যুগান্তর" পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট শ্রীপরিমল গোস্বামী ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির কাছ থেকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে প্রেরণা পেয়েছি, তাও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি। মদীয় অগ্রজ শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যক্ষেত্রে সহযোগী শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পড়ে নানা পরামর্শ দ্বারা আমার রচনাকে তথ্যসমৃদ্ধ করেছেন বলে এঁদের কাছেও আমার ঋণ বড় কম নয়। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির বিষয়ে আমায় সাহায্য করেছেন আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র গৌতমকুমার ঘোষ ও ছাত্রী অনুরাধা গাংগুলী। তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি" (Ancient Indian History and Culture) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে এঁরা দুজনেই আমার গুরু-স্থানীয়। ডক্টর দত্ত এই বইয়ের জন্য এক মূল্যবান ভূমিকা লিখে ও ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বিনয় সরকার সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত রচনা তৈরী করে দিয়ে আমার এই পুস্তকের মূল্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের কাছেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের নাম ও রচনা এই পুস্তকের সংগে সংযুক্ত থাকায় গৌরব অনুভব করছি।



বিনয় সরকার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক কাজকর্ম ও মতামতের সকল দিক আশানুরূপ ভাবে আলোচনা করতে পারিনি। এই ত্রুটি পরবর্তী কোনো লেখক দূর করতে পারলে খুশী হব। তবুও আশা করি এই পুস্তক একালের তরুণদের কাছে বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৌতূহল সঞ্চার করতে পারবে।

বইখানি স্বর্গত বিনয় সরকারের সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ইদা সরকারের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ-স্বরূপ উৎসর্গ করা হলো। ইতি—

১০৪নং বালিগঞ্জ গার্ডেনস্,
কলিকাতা-১৯
৭ জুলাই, ১৯৫৭

**হরিদাস মুখোপাধ্যায়**

# ভূমিকা

স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত আমার প্রথম চাক্ষুষ আলাপ হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে। আমি তখন মস্কো হইতে সবে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। ৺হেরম্বলাল গুপ্তের কাছ হতে শুনিলাম বিনয়কুমার সরকার প্যারিস হতে জার্মাণীতে আসিয়াছেন। পরে তাঁহারই উদ্যোগে তাঁহার গৃহে উভয়ের মিলন হয়। অবশ্য, স্বদেশীযুগে বিনয়কুমারের নাম আমার কর্ণগোচর হয়েছিল যে, যে কয়টি কৃতবিদ্য তরুণ জাতীয় শিক্ষা স্থাপন উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়েছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

তৎপর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত সম্বন্ধে সর্বপ্রথম যে বক্তৃতা বিনয়কুমার প্রদান করেন, সেইস্থলে লেখকও উপস্থিত ছিলেন। বড় বক্তৃতা হলটি বেশ ভালভাবেই ভর্তি হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ। বক্তৃতা অবশ্য ইংরেজী ভাষায় হয়েছিল। বক্তৃতামধ্যে ভারতের রাজনীতিক অভিব্যক্তির বর্ণনাকালে বক্তা "যুগান্তর" পত্রিকারও উল্লেখ করেন এবং আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি টিপ্পনী কাটিলেন: "আমরা এতদিন ভাবিতাম, ভারতীয়েরা কেবল গাছের তলায় বসে চোখ বুজে ধ্যান করে; এখন শুনিতেছি তাহা নয়। তবে বক্তার বক্তৃতা ultra-nationalist (চরম জাতীয়তাবাদীয়) ভাবপূর্ণ।" এতদ্বারা প্রতীত হয়, বিনয়বাবু ভারত সম্বন্ধে যে সব নূতন কথা

শুনাইলেন, তাহা সভাপতি হজম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভারত সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ও অলৌকিক গালগল্প শুনিতে অভ্যস্ত। কাজেই বিনয়বাবুর বক্তব্য বড় আক্রমণশীলক জাতীয়তাবাদ বলে তাঁহাদের কাছে বোধ হল।

বিনয়কুমারের দ্বিতীয় বক্তৃতা Deutsche Club দ্বারা আহূত হয়। এই স্থলেও ইংরেজীতে তিনি বলেন। এই বক্তৃতাতে তিনি ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন। একজন জার্মাণ অধ্যাপক সমালোচনা করিতে উঠিয়া বলেন, "আমরা ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বিপক্ষে। কারণ তাহা হইলে জার্মাণীর অর্থনীতিক ক্ষতি হবে। আমরা ইংরেজের মধ্যবর্তিতায় ভারতের সহিত কারবার করিতেছি।" অথচ জার্মাণী তখন বিজেতৃবর্গের পদানত হয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব করিতেছে। জার্মাণ পণ্ডিতের এমনি রাজনীতিক জ্ঞান! এই ঘটনা বিনয়বাবুও তাঁর কোন এক বাংলা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তৎপর, আর একজন অধ্যাপক ত্রস্তভাবে কেবল বলিতে লাগিলেন,—"ভারতে নাকি 'বোলচেভিকবাদ' জোরভাবে প্রচারিত হইতেছে।" বোধ হয় তিনি মহাত্মা গান্ধী দ্বারা প্রবর্তিত 'অসহযোগ আন্দোলন'কে বোলচেভিকবাদ প্রচার মনে করিতেন, আর তৎকালের জার্মাণ শ্রমিকসংবাদপত্র সমূহে প্রচারিত হত যে, ভারতের এই আন্দোলন আধা জাতীয়তাবাদীয় এবং আধা শ্রমিকবাদীয় আন্দোলন। আবার কমুনিষ্ট সংবাদপত্রে বলা হত—তৃতীয় বা কমুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল ইহার পশ্চাতে আছে, ইত্যাদি।



উপরোক্ত ত্রস্ত অধ্যাপকের প্রশ্নের জবাবে বিনয়বাবু বলিলেন: "যদি জার্মাণীতে বোলচেভিকবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব হয়, যদি ইংলণ্ডে বোলচেভিকবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হলে ভারতেও তাহা সম্ভব হবে।"

এই প্রকারের বক্তৃতা এবং বচনের মধ্যে বিনয়বাবুর ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যার ধারা প্রকাশ হত। বিনয়বাবু জার্মাণীতে ঐ কাছাকাছি সময় হতে আরম্ভ করে জার্মাণ ভাষাতেও অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও তার কিছুদিন পূর্বে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষায়ও বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতা তৎকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করিত। এতদিন ধরে ইউরোপীয়েরা বলেছেন, ভারত এক আজব দেশ, অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্বরেরা তথায় বাস করে, স্ত্রীলোককে জেন্তো পোড়ায়, ছেলেকে গঙ্গাসাগরে ফেলে, ধর্মের নামে নানা বুজরুগি করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মাণ নভেলিষ্ট লেখেন যে, ভারতে Heiden Priester ( হিদেন পুরোহিতেরা অর্থাৎ পৌত্তলিক পুরোহিতেরা ) রথে সিংহ জুড়িয়া মরুভূমি মধ্যে দৌড় করে (Theodore Storm: "Germelhausen" দ্রষ্টব্য )। আর, কলিকাতার রাস্তায় বাঘ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে কিনা এবং সাপ দলে দলে তথায় বেড়াচ্ছে কিনা, ইহার জবাবদিহি করিতে আমাদের তৎকালে বিদেশে প্রাণান্ত হতে হতো।

এই সকল নানা অদ্ভুত বা উদ্ভট ভাবধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতের সপক্ষে ধর্মপ্রচারকদের দল উত্থিত

হন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে, ভারতবর্ষ এক আজগুবী কর্মপূর্ণ দেশ বলে গণ্য হতে লাগিল। ভারতের জঙ্গলে ও পর্বতগুহায় সব অদ্ভুতকর্মা "যোগী" আছেন, পর্বতে সব Astral Mahatma থাকেন, সেই দেশে আশ্চর্যজনক rope-trick হয়, আকাশে ফুল গাছের টব উঠান হয়। তৎপর বেদান্তপ্রচারকেরা আমেরিকায় গিয়ে বলিলেন, তাঁহারা কেবল health culture প্রক্রিয়া শিক্ষা দেন ( ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের কোন পত্রিকায় স্বামী অভেদানন্দের উক্তি ); আর প্রাচীন হিন্দু মনোবিজ্ঞানের therapeutic value আছে, অর্থাৎ ব্যারাম ভাল করা শিক্ষা দেয় ( Swami Akhilananda : Mental Health and Hindu Psychology দ্রষ্টব্য )। অবশ্য তাঁহারা ভারতের ভালর দিকে টেনেই কথা বলেছেন। কিন্তু এই নূতন জাতীয়তাবাদীয়দেরও একদেশদর্শিতা ছিল। তাঁহারা কেবল ভারতকে "ধর্মের দেশ" অভিহিত করেছেন—ভারতের জাতীয় সাধনা কেবল ধর্মোন্মত্ততার মধ্যে নিমগ্ন; ভারতের সভ্যতা ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত ইত্যাদি কথা বলেছেন। বিদেশীয় আক্রমণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই মতবাদ ওঠে। ৺তিলকের Arctic Home in the Veda-র সময় থেকে এই সুরের উদয় হয়। জাতীয় জীবনে পৃথিবীর মধ্যে কোনঠাসা হওয়ার ফলে ভারতীয়দের এই মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয়*(১)।

* (১) "During the nineteenth century, the people of India were divorced perforce from the vitalizing interests and responsibilities in every field of work. They had necessarily to fall back upon the super-sensual, the nonmaterial, the 'spiritual'. The Hindus of this period entirely misunderstood the spirit of the *Upanishads*, *Gita*, *Vedanta*, and other philosophical bequests of their forefathers. The Indians, emasculated and demoralised as they had to be by pressure of circumstances, popularised a false doctrine of *maya* or 'world as illusion' without understanding the sense or context of the original propounders." Vide B. K. Sarkar's "*The Futurism of Young Asia*, pp. 166-67.



এই উভয় প্রকার মনস্তত্ত্বের বিপক্ষে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োজিত করেন। ভারতীয়েরা এবং এশিয়াবাসীরা কেবল ধর্ম-পাগলা হয়েই ইহজগতে এসেছে, এই ধারণার বিপক্ষেই অধ্যাপক সরকার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োজিত করে স্বদেশবাসী ও বিদেশীদের বুঝাইবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয়েরা কেবল গাছের তলায় বসে চোখ বুজে থাকিত ও পরলোকের চর্চায় বিভোর হয়ে থাকিত। এই বিষয়ে ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকের অনূদিত কবিরাজা হালের "সপ্তসতি" পুস্তকে তাঁহার মন্তব্য দ্রষ্টব্য। এই জাতীয় গল্পের বিরুদ্ধেই তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়োজিত করেন। প্রাচীনকালে যেমন ভারতীয়েরা দর্শনশাস্ত্র রচনা করেছেন, ধর্মাত্মক পুস্তক লিখেছেন, তদ্রূপ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"ও রচিত হয়েছিল, বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্যের রণনীতি বিষয়েও পুস্তক রচিত হয়েছিল, রসায়নেরও চর্চা হয়েছিল ও বিদেশে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। যদি প্রাচীনকালে 'ধর্মশাস্ত্র'সমূহ রচিত হয়েছিল, তদ্রূপ 'অর্থশাস্ত্র'

সমূহও বিরচিত হয়েছিল, চিকিৎসা-বিদ্যা এবং অস্ত্রোপচার বিদ্যারও ( surgery ) চর্চা হত। উত্তরে খোটান, দক্ষিণে যবদ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিমে আরবদেশ ও পূর্ব আফ্রিকা, পূর্বে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও লুচু দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয়দের বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত ছিল। প্রথমোক্তদের মতের বিপক্ষে ইহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বিনয়বাবুর বক্তব্য ছিল এক কথায় এই, যে কারণে ও যে বাতাবরণে ( environment ) পাশ্চাত্যদেশে যে সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে, সেই সব অবস্থানুসারে ভারতেও সেই প্রকার অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং হইবে। মানুষ পৃথিবীর সর্বত্রই মূলত এক। এশিয়াবাসীদের ও পাশ্চাত্যবাসীদের মনস্তত্ত্ব মূলত পৃথক নয়। উপরোক্ত জার্মাণ অধ্যাপকের ত্রস্ত প্রশ্নের উত্তরে বিনয়বাবুর ঐরূপ উত্তরের অর্থ ই তাহাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় বিনয়বাবুর দৃষ্টিভঙ্গী বুঝবার জন্য Futurism of Yonng Asia পুস্তক দ্রষ্টব্য। ঐ বই ১৯২২ সনে লাইপজিগ সহর থেকে প্রকাশিত হয়।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অধ্যাপক সরকার প্রাচীনপন্থীদের কাছে আদরণীয় না হতে পারেন। যাঁহারা ইংরেজ দ্বারা ভারতের কৃষ্টির ব্যাখ্যার জাবর কেটে নিজেদের মৌলিক গবেষণাকারী দার্শনিক, ঐতিহাসিক বলে জাহির করেন, যাঁহারা উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী পণ্ডিতের সহিত 'হামেহাম' দিয়ে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করেন ( লেখকের



স্বাধীন মতের জন্য এই বিষয়ে অবাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতাও আছে ), তাঁহারা স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বাধীন চিন্তার বিরোধী বলেই কৃষ্টি-ক্ষেত্রে বিনয়বাবুর যথার্থ স্থান নিরূপণ করিতে আজিও অনিচ্ছুক।

কিন্তু কালের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। স্বাধীন ভারতে নূতন শিক্ষকের দল উঠিবেন, যাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবেন ও যথাযথ মূল্য দিবেন। এই নূতন মনোভাবের প্রথম উন্মেষ দেখি সিন্ধু-সভ্যতা বিষয়ে নূতন ব্যাখ্যা যাহা স্বাধীন ভারতের সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দিতেছেন। এইভাবে কালক্রমে ভারতের কৃষ্টির যথার্থ ভারসাম্য নিরূপিত হবে। ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাসের ভারসাম্য নির্দ্ধারণ করাই ছিল বিনয়বাবুর ব্রত। প্রাচীন ভারতের লোক ধর্মও করেছে আর কর্মও করেছে, ইহাই ছিল বিনয়বাবুর প্রথম বক্তব্য। নূতন ভারত নূতন ভাবে জাগিতেছে, ইহাই ছিল দ্বিতীয় বক্তব্য।

লেখকের অভিজ্ঞতা এই যে, ভারতপ্রেমিক পাশ্চাত্যবাসীরা "ভারত" অর্থে মধ্যযুগীয় ভারত মনে করেন, এবং এদেশে আসিয়া অলৌকিক গল্পের দেশ দেখিতে চান। ( Bruntonএর "In Search of Secret India" পুস্তক দ্রষ্টব্য। ) তাঁহাদের কাছে কেহ "নূতন ভারত" যাহা উত্থিত হইতেছে, তাহার কথা বলেন না। ভারত যে rope-trick, snake charming ও Astral Mahatmaর দেশ নয়, এই দেশের লোক যে উন্নততর পাশ্চাত্যদেশসমূহের সহিত টক্কর দিয়ে চলিতে সমর্থ, তাহা কেহ দেখাইয়া দেন না। এই বিষয়েই অঙ্গুলি

নির্দেশ করে বিনয়বাবু দেখাইতেন। ভারতীয়েরা পাশ্চাত্য-বাসীদের মতনই জাগতিক ও সাংসারিক ক্ষেত্রে সুদক্ষ ছিল এবং আবার সমান-সমান হবার লক্ষণ দেখাইতেছে, পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে যাহারা ভারততাত্ত্বিক, তাহারা এরূপ ব্যাখ্যা দিতে চান না ; ইহা তাঁদের স্বার্থেরও বিরোধী। ভারতের আদর্শ পাশ্চাত্যের আদর্শ হতে সম্পূর্ণ পৃথক, এই কথা পাশ্চাত্যের ভারতপ্রেমিক গবেষণাকারীরা আমাদের বহুদিন ধরে শোনাইয়াছেন ও এখনও শোনান। বিনয়বাবু এই ধরণের পণ্ডিতকে ভারতের শত্রু বলে জ্ঞান করতেন। বার্লিনে একবার তিনি লেখককে বলেছিলেন, ইণ্ডোলজিষ্টরাই এক অর্থে ভারতের স্বাধীনতার ঘোর শত্রু। ( ইংরেজ পণ্ডিত কিথ্ ইণ্ডিয়া আফিসে চাকুরী করিতেন ও ভারতের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন )*(২)।

বিদেশে বিনয়বাবু ভারতের কৃষ্টির গতিশীলতার কথা প্রচার করিতেন ও তাহাদের ভারতকে নূতন চক্ষে দেখিবার জন্য বলিতেন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মানবজীবনের এই সকল বিষয়েই প্রাচীন ভারতীয়েরা অনুশীলন করেছিলেন এবং ঐ অনুশীলনে তারা পাশ্চাত্যবাসীদের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন না, ইহাই

*(২) ১৯৪৮ সনে "বৈঠকী" আলোচনা প্রসংগে বিনয়বাবু একজন ফরাসী পণ্ডিতকে বলেন যে, "Those of the Indologists and Orientalists who constantly harp on the alleged spiritual genius of the Hindus or an alleged fundamental difference between the Eastern and Western peoples very often function, consciously or unconsciously, directly or indirectly, as the spies and agents of the colonialists and imperialists." বর্তমান গ্রন্থের লেখক উক্ত বৈঠকী আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।



বিনয়বাবু গবেষণা করে সকলকে দেখাইয়াছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল : "শিল্পজগতে বিপ্লব সাধিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ওয়াশিংটন, আডাম স্মিথ্ ও নেপোলিয়ানের সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থিক বা বিচার-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ছিল না, যার প্রায় সমান সমান অথবা এমন কি একদম দোসর বা জুড়িদার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। আমি জগতের সমক্ষে এই কথা ঘোষণা করিতেছি যে, সমাজতত্ত্ব শাস্ত্রের সংশোধন একমাত্র তখনই সম্ভবপর হইবে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয়েরই যে জীবন বা আদর্শ মূলত একরূপ বা সমান এই সত্যটি সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রথম স্বীকার্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে" ( বার্লিনের ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে বিনয়বাবুর প্রদত্ত বক্তৃতার জন্য "নয়া বাংলার গোড়াপত্তন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য )। বিনয়বাবুর প্রতিপাদ্য ছিল, উভয় দেশের জীবনযাত্রা ও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি যুগের পর যুগ ধরে তুলনা করিয়া দেখ ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায় বা কতটা। এই তুলনামূলক আলোচনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লয়ে পাশ্চাত্যবাসীরা প্রায়ই করেন না। গ্রীস থেকে তাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতার তারিখ গণনা করেন ; কিন্তু প্রাচীন গ্রীসীয় মাইকিনীয় যুগ যাহা প্রত্নতাত্ত্বিক তাম্রযুগের অন্তর্গত, সেই গ্রীসীয় তাম্রযুগের সহিত সিন্ধু উপত্যকার তাম্রযুগের মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার তুলনা করিয়া দেখ, কে বড় বা কে ছোট ছিল *( ৩ )।

* (৩) B. K. Sarkar's *Creative India*, pp. 1-12 দ্রষ্টব্য।

এই সব নূতন কথা, ভারত বিষয়ে এইরূপ তুলনাসাধন সাম্রাজ্যবাদীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য, আর তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্যবর্গেরা যাঁহারা পুরাতন ইউরোপীয় ভারত-ব্যাখ্যার জাবর কাটিতেছেন, তাঁহাদের কাছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। এইপ্রকার তুলনা দ্বারা ভারতের কৃষ্টির স্বরূপ বিদেশীকে বুঝানো এবং এই ধারায় ভবিষ্যৎ ভারতের দাবী সমর্থন করাকে aggressive nationalism বলে অভিহিত করা হয়। বিনয়বাবু এই আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদের প্রচারক ছিলেন। ভারতীয় কৃষ্টিকে তিনি যে নূতন মূর্তিতে দেখাইতেন, সেইজন্যই অনেক পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিত তাঁর সহিত ভারত সম্বন্ধে একমত হন নি।

শেষে বিনয়বাবুর আমেরিকায় যাইবার প্রাক্কালে ( ১৯৪৯ ) তাঁর বন্ধুবর্গ একটা বিদায়-সভা আহ্বান করেন। তাহাতে কয়েক শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক ছিলেন ইউরোপীয় ও আমেরিকান। সেই সভায় লেখক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক সরকার একদিন বিদেশে ভারতসম্বন্ধে aggressive nationalism ( আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদ ) প্রচার করেছেন; এক্ষণে সেই দেশে nationalism triumphant ( জাতীয়তাবাদ বিজয়ী ) হয়েছে এবার তিনি তাহা প্রচার করুন। ইহাই তাঁহার সহিত শেষ দেখা।

আশা করি অধ্যাপক সরকারের গুণগ্রাহীরা তাঁহার ইতিহাস অনুশীলনের ধারা ধরিয়া স্বদেশের কৃষ্টির অনুসন্ধান



কার্যে ব্যাপৃত হবেন। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের অনুরাগী ছাত্র ও উদীয়মান গবেষক। ইতিপূর্বে তিনি ও তাঁর পত্নী অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় স্বদেশী আন্দোলনের কোন কোন দিক নিয়ে মিলিতভাবে গবেষণা করেছেন ও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁহাদের গবেষণার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখে বড়ই আনন্দ বোধ করিতেছি। এক্ষণে অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় বহু পরিশ্রম করে বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চা সম্বন্ধে যে চিন্তাপূর্ণ পুস্তক লিখেছেন, তাতে আমি বিশেষ সুখী। আশা করি তাঁর এই পুস্তক পাঠ করিয়া এদেশের তরুণগণ বিনয়বাবুর ইতিহাস-চর্চা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা পাইবেন।

৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
৪।৪।১৯৫৭

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

# ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার

## ( ভারতীয় সংস্কৃতির নয়া ব্যাখ্যা )

### ঐতিহাসিক গবেষণা কি বস্তু ?

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েন্‌বির মতামত আলোচনা-প্রসংগে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার মহাশয় লিখেছেন : "ইতিহাসকে দেখবার দুইটি ধরণ আছে। স্বল্পপরিসর কয়েকটি বছরসংক্রান্ত দলিলপত্র ইত্যাদি সমস্ত নজির সংগ্রহ করে' সীমাবদ্ধ সেই সময়টুকুর একটা প্রামাণ্য বিবরণী লিখবার চেষ্টা করা যেতে পারে। একাজ অপরিহার্য, কিন্তু এখানে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি খণ্ডিত ও আংশিক হ'তে বাধ্য। অনুসন্ধিৎসু মানুষের মন শুধু এই নিয়ে তৃপ্ত থাকে না। গোটা একটা বড় যুগ, দেশ বা সমাজবিশেষের সম্পূর্ণ ছবি, এমন কি সমস্ত মানবজাতির বিশাল অভিজ্ঞতা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার প্রেরণাটাও নিতান্ত স্বাভাবিক। একে ইতিহাসের রূপ বা ধারা সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টি বল্‌ব। এখানেও দলিলপত্র ইত্যাদি ঐতিহাসিক মালমস্‌লাকে অগ্রাহ্য করা চলে না, করলে ব্যাপক ব্যাখ্যা ইতিহাস না হয়ে নিছক মনগড়া সাহিত্য-সৃষ্টিতে পর্যবসিত হবে ; কিন্তু মালমস্‌লা ছাড়াও বিশ্লেষণী প্রতিভা, তুলনামূলক আলোচনা এবং বিজ্ঞানসম্মত কল্পনাশক্তির এখানে প্রয়োজন। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও আংশিক দৃষ্টিতে অভ্যস্ত সাধারণ ঐতিহাসিক ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করতে নারাজ।

অথচ এটাও নিঃসন্দেহে ইতিহাস-চর্চা, আর উৎসুক পাঠক-সমাজের মনে যে এর টান স্বাভাবিক ও প্রবল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই"*(১)। বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চায় ও গবেষণায় পূর্বোক্ত দুইটি ধারাই উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট, বিশেষ করে দ্বিতীয় ধারাটি। আর বোধ করি এই কারণেই তিনি "সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও আংশিক দৃষ্টিতে অভ্যস্ত সাধারণ ঐতিহাসিক" বা পণ্ডিতের কাছে অনেক সময়ই দুরূহ বা দুর্বোধ্য হয়ে রয়েছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিশিষ্ট ইতিহাস-অধ্যাপক বিনয় সরকারকে "ঐতিহাসিক" বলার দরুণ বর্তমান লেখককে ধমক দিয়েছিলেন। সে ধমক শিক্ষক ও আচার্যের ধমক বলে আশীর্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করেছিলাম। এই গ্রন্থের মূল প্রেরণাদাতা হিসাবে সেই শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের কাছেই বর্তমান লেখক সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী।

## বিনয়কুমারের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী

বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তি বিনয় সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯)। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতায় তিনি এযুগের বাঙালীদের মধ্যে প্রায় অদ্বিতীয়। বংগসংস্কৃতিতে তাঁর দানের প্রাচুর্যের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। একালের সুধীসমাজ তাঁকে সাধারণতঃ একজন মস্ত বড় সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থশাস্ত্রীরূপে সম্‌ঝিতে

* (১) "ইতিহাস" পত্রিকার চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, মাঘ, ১৩৬০, পৃঃ ৯০-৯৯ দ্রষ্টব্য। হালে বাংলা ভাষার মাধ্যমে টয়েন্‌বির ঐতিহাসিক মতামত নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার ("ইতিহাস", প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৩৫৭) এবং শ্রীযুত বুদ্ধ প্রকাশ (মডার্ণ রিভিয়ু, নবেম্বর, ১৯৫৩)। ইতিপূর্বে বিনয় সরকার তাঁর "দি পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ্‌ সিন্স্‌ ১৯০৫" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় ভাগে (১৯৪২) টয়েন্‌বি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন।



অভ্যস্ত; কিন্তু সেই সংগে তিনি যে আবার একজন প্রধান ঐতিহাসিক, সে কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বিদ্যার বিচিত্র বিভাগে পারদর্শী হয়েও তিনি "বিশেষজ্ঞদের গণ্ডিবদ্ধ অনুশীলনেই" সন্তুষ্ট থাকেন নি; এক ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে তিনি মানুষের ইতিহাস ও মানব-সভ্যতার ধারা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন। ইতিহাস-চর্চায় তাঁর সবচেয়ে বড় দান বা কৃতিত্ব এইখানে।

বিনয় সরকারের ইতিহাস-গবেষণার ফলাফল দেশী-বিদেশী পাঁচ-ছয়টা ভাষায় লিপিবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। তাঁর ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান রচনার তালিকা আপাতত হিসাব থেকে বাদ দিয়ে যাচ্ছি। কেবল তাঁর ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর সাহায্যেই বর্তমান আলোচনা করছি। তাঁর যে সকল ইংরেজী গ্রন্থ ঐতিহাসিক গবেষণার সাক্ষ্য বহন করে, তার মধ্যে "দি সায়েন্স্‌ অব হিস্‌ট্রি অ্যাণ্ড হোপ অব ম্যানকাইণ্ড" (ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা, লণ্ডন, ১৯১২), "শুক্রনীতি" (মূল সংস্কৃত থেকে ইংরেজী ভাষায় তর্জমা ও তৎসহ টীকা-টিপ্পনী, এলাহাবাদ, ১৯১৪), "দি পজিটিভ্‌ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি" (হিন্দু সমাজতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি, চার খণ্ড, এলাহাবাদ, ১৯১৪, ১৯২২, ১৯২৭ ও ১৯৩৭), "চাইনিজ্‌ রিলিজিয়ান থ্রু হিন্দু আইজ্‌" (হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম, সাংহাই, ১৯১৬), "দি ফোল্‌ক-এলিমেণ্ট ইন হিন্দু কালচার" (হিন্দু সংস্কৃতিতে জনসাধারণের দান, লণ্ডন, ১৯১৭), "দি পোলিটিক্যাল ইনষ্টিটিউশ্যনস্‌ অ্যাণ্ড থিয়োরীজ্‌ অব দি হিন্দুজ্‌" (হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শন, লাইপৎসিগ, ১৯২২), "দি ফিউচারিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা, লাইপৎসিগ, ১৯২২), "হিন্দু পলিটিক্‌স ইন ইতালিয়ান" (ইতালিয়ান ভাষায় হিন্দুজাতির রাষ্ট্রনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬), "দি পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ্‌ সিন্স্‌ ১৯০৫" (১৯০৫-এর পরবর্তী রাষ্ট্র-

দর্শন, প্রথম খণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯২৮ ও শেষ তিন খণ্ড, লাহোর, ১৯৪২ ), "ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া" ( স্রষ্টা ভারত, লাহোর, ১৯৩৭ ) ও "ডমিনিয়ান ইণ্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড-পারস্পেকটিভ্স্" ( বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ডমিনিয়ন ভারতের স্থান, কলিকাতা, ১৯৪৯ ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায়ও তাঁর গবেষণার ফলাফল বহু গ্রন্থে ধরা আছে, যেমন "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" ( ১৯১০ ), "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" (১৯১২), "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪), "বর্তমান জগৎ" ( তের খণ্ড, ১৯১৪-৩৫ ), "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" ( ১৯২৬ ), "একালের ধন-দৌলত ও অর্থশাস্ত্র" ( দুই খণ্ড, ১৯৩০-৩৫ ), "বাড়তির পথে বাঙালী" ( ১৯৩৪ ) ও "বাংলায় দেশী-বিদেশী" ( ১৯৪২ )। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত পুস্তকাবলীর প্রত্যেকটাই মামুলী অর্থে ইতিহাস-গ্রন্থ নয়; কিন্তু অ-ঐতিহাসিক গ্রন্থ-গুলির ভেতরও ঐতিহাসিক তথ্য ও তথ্য-বিশ্লেষণ এত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার যে, বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চা প্রসংগে ঐগুলির নামোল্লেখও অবশ্য কর্তব্য।

## ডন সোসাইটীতে ইতিহাস-সাধনা

বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রথম পর্ব আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটী" ( ১৯০২-০৭ ) ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত "বেংগল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুলের" ( ১৯০৬-১০) সংগে সুজড়িত*(২)। স্বদেশীযুগের (১৯০৫-১১) ইতিহাস-গবেষণায়

* ( ২ ) বর্তমান লেখক প্রণীত "বিনয় সরকারের জীবন-দর্শন" ( মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৫৬ ) শীর্ষক প্রবন্ধটি ও তৎপ্রণীত "Benoy Kumar Sarkar : A Study" গ্রন্থখানি ( মার্চ, ১৯৫৩ ) এই প্রসংগে পঠিতব্য। ডন সোসাইটী ও সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বর্তমান লেখক "মডার্ণ রিভিয়ু" ( মে, ১৯৫৩ ) ও "জয়শ্রী" ( অক্টোবর, ১৯৫৬ ) পত্রিকায় এবং অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় ( ১৯ এপ্রিল, ১৯৫৩ ) আলোচনা করেছেন।



গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত ( ১৮৪৮-১৯০৯ ), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ( ১৮৫৩-১৯৩১ ), দীনেশচন্দ্র সেন ( ১৮৬৬-১৯৩৯ ), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ( ১৮৬১-১৯৩০ ) ও যদুনাথ সরকার ( ১৮৭২- ) শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। সেই সংগে আর একজন অধুনা-বিস্মৃত মনীষীর নামোল্লেখও প্রয়োজন। তিনিই "ডনের" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( ১৮৬৫-১৯৪৮ )। একথা আজ অনেকেই জানেন না যে, তৎকালে সতীশচন্দ্র "ডন" পত্রিকার ( ১৮৯৭-১৯১৩ ) মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার ধারাকে অতি উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর স্বকীয় রচনাগুলি আজ পর্যন্তও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় ও আবার ঐগুলির অধিকাংশই তৎকালে অস্বাক্ষরিত অবস্থায় সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করায় নব্য বাংলার অন্যতম দীক্ষাগুরু হয়েও সেকালের সতীশচন্দ্র একালের বাঙালীর কাছে বিস্মৃত-প্রায়। তিনি যে লেখক-গোষ্ঠী নিজের হাতে গড়েছিলেন, তার মধ্যে হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয়কুমার সরকার, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও রাজেন্দ্র প্রসাদের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার ধারায় এঁদের অবদান এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে। "বৈঠকে" বিনয় সরকার বলেছেন—"সতীশবাবুর আবহাওয়ায় পড়েছিলাম ব'লে জীবন ধন্য হয়েছে।"

ডন সোসাইটী ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আবহাওয়ায় বিনয় সরকার যে গবেষণা-ব্রত গ্রহণ করেন, তা তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পালন ক'রে গেছেন সুগভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে। জ্ঞানচর্চায় ও সত্যানুসন্ধানে তিনি ছিলেন সক্রেটিসের অনুগামী। বন্ধুর বিদ্রূপ বা কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি তাঁকে তাঁর জ্ঞানচর্চা থেকে কোনোদিনই টলাতে পারে নি। এক বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয় ও বিস্ময়কর প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে তিনি আমৃত্যু জ্ঞান-চর্চায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। "অজস্র তাঁহার অবদান, অফুরন্ত

তাঁহার প্রাণশক্তির উৎস। বাঙালী সম্পূর্ণরূপে বিনয় সরকারকে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই" ("দেশ" পত্রিকার মন্তব্য, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৩)।

বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনার নাম "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" প্রবন্ধ। ১৯১১ সনের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ঐ সম্মেলনে বিনয়কুমার উল্লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি বা অবনতির সংগে বিশ্বশক্তির (world-forces এর) যোগাযোগ বিশ্লেষণই ছিল ঐ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। উক্ত রচনা ১৯১১ সনেই "প্রবাসী" পত্রিকায় ছাপা হয়। ঐ বিষয়ের উপর তাঁর ইংরেজী পুস্তকের নাম "দি সায়েন্স অব হিস্ট্রি অ্যাণ্ড হোপ অব ম্যানকাইণ্ড"। ১৯১২ সনে বিলাত থেকে উহা প্রকাশিত হয়। বাংলা রচনাটি পরে "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে (১৯১২) স্থান পায়। এই দুই পুস্তকের মধ্যে বিনয়কুমারের ইতিহাস-দর্শন পরিষ্কারভাবে, যদিও সূত্রাকারে ব্যক্ত হয়েছে। তাই আকারে ক্ষুদ্র হলেও এই বই দুখানি বিশেষ মূল্যবান। "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৯১২ সনে মন্তব্য করেছিলেন: "অর্দ্ধশত বৎসরের উপর হইল, ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে স্থাপিত হইয়াছে···কিন্তু এই ইতিহাস বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা কখনও আমাদের মধ্যে আসে নাই।···স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথা আলোচনা করিয়া তাহা হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা দেখি না। এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এজন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল একটি উদাহরণ মনে পড়ে, সে স্বর্গগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়।···বাঙ্গালা দেশে একটি ভূদেব বই জন্মিল না। হায় বাঙ্গালা দেশ!···শ্রীমান্ বিনয়কুমার সরকার উৎসাহশীল অধ্যবসায়শীল যুবা। ইঁহার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা আছে, ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অনুরাগ আছে। এই তরুণ বয়সে ইঁহার উদ্যমের



পরিচয় পাইয়া আশার সঞ্চার হয়। ইনি স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথা আলোচনা করিয়াছেন, সেই তুলনামূলক আলোচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার অর্জনে উদ্যম করিতেছেন।" এখন দেখা যাক এই গ্রন্থে ও "ইতিহাস-বিজ্ঞান" পুস্তকে বিনয়কুমারের মূল বক্তব্য কি কি।

## ইতিহাস-বিজ্ঞানের সূত্রাবলী

ইতিহাস-চর্চায় যে সকল পণ্ডিত মানবজীবনের ভগ্ন ও খণ্ড অংশ নিয়ে গবেষণার পক্ষপাতী, বিনয় সরকার তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে মানব-সভ্যতার গতি ও প্রকৃতির পর্যালোচনাই ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। এজন্য তাঁর মতো ঐতিহাসিককে নানা বিদ্যার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বিষয়েও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যাচর্চার প্রয়োজন হয়ে থাকে। খণ্ড ও অংশের উপর সঠিক অধিকার না থাকলে ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টিতে মানব-সভ্যতার পর্যালোচনা কখনোই সুন্দর ও সার্থক হয় না; কিন্তু এজন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার, তা সাধারণ পণ্ডিতের নাগালের বাইরে।

দ্বিতীয়ত, বিনয়কুমার ঐতিহাসিক আলোচনার যথার্থ বস্তু হিসাবে "রাষ্ট্রের" পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন "সমাজ"। মানুষ সকলের আগে সামাজিক জীব; রাষ্ট্র হলো সমাজ-জীবনের একটা অংশ মাত্র। সমাজ-জীবনে অ-রাষ্ট্রিক দিক্‌টাও নেহাৎ বড় কম নয়। প্রকৃতপক্ষে "রাষ্ট্রের" থেকেও বৃহৎ ও আদি বস্তু হলো মানুষের "সমাজ"। "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" (১৯১২, পৃঃ ৭২-৭৪) গ্রন্থে বিনয়কুমার লিখেছেন: "আজকাল জ্ঞানচর্চা শ্রমবিভাগনীতির অতিশয় অধীন হইয়া পড়িয়াছে। জটিল সমস্যাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র আলোচনা-প্রণালী অবলম্বনের প্রতি সাহিত্যের গতি

ধাবিত হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানগুলি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও বিশিষ্টতা-প্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই সঙ্কীর্ণতা ইতিহাস-সমালোচনায়ও প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর বিবরণরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ইতিহাসক্ষেত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ আজকাল রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী, সন্ধিবিগ্রহ, রাজ্যবিস্তার, রাজ্যক্ষয়, জয়পরাজয়, এক-রাষ্ট্রীয়তার বিকাশ ও লোপ প্রভৃতি বিবিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি আলোচনার জন্যই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডিতেই তাঁহাদের সমগ্র শক্তি ও সময় প্রয়োগ করেন। পরিবার, সমাজ, শিল্প, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রের উপর মানবের যে কার্য হইয়া থাকে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমূহের ফলে মানবের জীবন যে যে বিচিত্র উপায়ে রূপান্তরিত হয়, সেই সমুদয়ের আলোচনার জন্য ঐতিহাসিকেরা স্বতন্ত্র কর্ম্মিগণের উপর নির্ভর করেন।

"এই শ্রমবিভাগনীতির ফলে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাগুলি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া অতি সত্বরই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে বটে এবং ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতাবিধানে যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এরূপ অনৈক্যবশতঃ সমগ্র জ্ঞেয় জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা আবিষ্কারের পক্ষে অসুবিধা হয়। ইতিহাস ইহার ফলে প্রকৃত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠনের ভিত্তি ও উপকরণসমূহ প্রদান করিয়া মানব-জগতের বিশেষ এক বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতে সমগ্র মানবের আশা, ভরসা, উন্নতি, অবনতি, লাভালাভ প্রভৃতির নিয়মগুলি আয়ত্ত করিবার দিকে বিশ্বজগতের মনোযোগ শিথিল হইয়াছে।

"মানব কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় জীব নহে। সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রই মানবের লক্ষণ বা পরিচয় এবং সুখ-দুঃখের পরিমাপক নহে। মানবের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান, বৃত্তি ও প্রবৃত্তির পরিচয় গ্রহণ না করিলে মানব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। এজন্য



সমগ্র মানব-জীবনের আলোচনা না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশাদি ইঙ্গিত করিতে অসমর্থ হইবে।"

এই কারণেই বিনয়কুমারের মতে ইতিহাসের যথার্থ আলোচ্য বস্তু হ'লো "সমাজ"। ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে এই অভিনব দৃষ্টিভংগীর গুরুত্ব ফরাসী পণ্ডিত গোবিনোঁ (Gobineau) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘোষণা করেন (১৮৫৩-৫৫)। বিনয়কুমার এই দৃষ্টিভংগীর বাঙালী প্রতিনিধি। ইংরেজ সমাজে এই মত ও পথের প্রতিনিধি-পুরুষদের মধ্যে আর্নল্ড টয়েন্‌বির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ সনে তাঁর "এ স্টাডি অব হিস্‌ট্রি" নামক বিশাল গ্রন্থের প্রথম তিনখণ্ড প্রকাশিত হয় (অন্যান্য খণ্ড পরে বাহির হয় ১৯৩৯ সনে)। এই ধরণের গ্রন্থ একই সংগে ইতিহাস-বিদ্যা ও সমাজশাস্ত্র-বিষয়ক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। জার্মাণ নজির দিয়ে অস্‌ওয়াল্ড স্পেংলারের "দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট" গ্রন্থের (পশ্চিমের অবসান, দুইখণ্ড ১৯১৭-২৩) ও মার্কিন নজির দিয়ে পিটিরিম সোরোকিনের "দি সোশ্যাল অ্যাণ্ড কাল্‌চার‍্যাল্ ডিনামিকস্" (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর, চার খণ্ড, ১৯৩৭-৪৩) বইয়ের নামোল্লেখ এই প্রসংগে করা চলে *(৩)। শেষ সিদ্ধান্ত বা মতামত সম্বন্ধে এঁদের পারস্পরিক মিল বা অমিল কতটা সে প্রশ্ন আলাদা।

তৃতীয়ত, বিনয় সরকারের মতে মানব-জীবনের ভাঙা-গড়া, সমাজের রূপান্তর, রাষ্ট্রিক গড়নের রদ-বদল, সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ বা সভ্যতার বিবর্তন—এর কোনোটাই একমাত্র ব্যক্তিগত বা জাতিগত চেষ্টার ফল নয়—এদের সবগুলিই "বিশ্বশক্তি"র দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত

*(৩) স্পেংলার ও সোরোকিন সম্বন্ধে বিনয় সরকারী আলোচনা তৎপ্রণীত "ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ্ সোশ্যাল পার্টার্ণস্" (পল্লী ও সহরের সামাজিক গড়ন, কলিকাতা, ১৯৪১) গ্রন্থে সুবিস্তৃত আকারে পাওয়া যায়।

ও নিয়ন্ত্রিত। "বিশ্বশক্তি" পরিভাষায় তিনি কোনো আধ্যাত্মিক, অতি-মানবিক, দৈবীশক্তি বুঝেন নি। মানুষের যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি—মানবিক ও প্রাকৃতিক যে পরিবেশ—এর সবগুলি উপাদানকে (আর্থিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রিক ও যৌন) একত্র করে যে পটভূমি দাঁড়ায়, তারই নাম দিয়েছেন "বিশ্বশক্তি" (বা ওয়ার্ল্ড-ফোরসেস্)। কোনো সমাজ বা জাতির উন্নতি বা অবনতি কেবল তার নিজ "কব্জার জোরে" ঘটে না। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সপক্ষে বা বিপক্ষে অহর্নিশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোনো দেশের সংস্কৃতি বা সভ্যতা শুধু জাতীয় চেষ্টা, শক্তি বা প্রেরণায় গড়ে ওঠে না—তার সংগে বৈদেশিক চিন্তা, কর্ম ও আন্দোলনের প্রভাবও সুজড়িত থাকে। তাই বিনয়কুমার ১৯১১-১২ সন থেকে জাতীয় উন্নতির জন্য "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের" (utilisation of world-forces এর) গুরুত্ব ঘোষণা করেন। "বিশ্বশক্তি" নামক গ্রন্থে (১৯১৪) এই মতবাদ আরও জোরের সংগে ঘোষিত হয়। "বিশ্বশক্তি সদ্ব্যবহারের" মন্ত্র বিনয় সরকারী ঐতিহাসিক গবেষণায় বিশেষ উঁচু স্থান দখল করে আছে * (৪)।

---

* (৪) "The political emancipation of India will be achieved, as world-forces should lead one to believe, not so much on the banks of the Ganges and the Godavari as on the Atalantic and the Pacific, not so much in the Indus Valley or on the Deccan Plateau as in the Chinese plains, the Russian steppes or the Mississippi Valley. Young India can therefore hardly afford to remain indifferent to 'entangling alliances' among the nations of the world,—but must have to be in evidence in every nook and corner of the globe. Kinship with world-culture is the only guarantee for India's self-preservation and self-assertion." (*The Futurism of Young Asia*, Leipzig, 1922, pp. 306-307)



চতুর্থত, ইতিহাস বিদ্যাকে বিনয় সরকার "বিজ্ঞান" হিসাবে দেখতেন। মানুষের ইতিহাসকে তিনি কখনো শুধু ঘটনাস্রোত বলে মনে করেন নি। ইতিহাসের গতিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা সাধারণ দৃষ্টিতে অসংলগ্ন বা অদ্ভুত বলে মনে হয়; কিন্তু যেগুলিকে আপাতত অসংলগ্ন বলে মনে হয়, তাও কোনো-না-কোনো ভাবে কার্য-কারণের সূত্রে গ্রথিত থাকে। যেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক, অনিশ্চিত, অজ্ঞাত বা অপরিচিত সুযোগ বা শক্তি বলে ধরা হয়, সেগুলিও মানুষেরই সৃষ্টি। ইতিহাসের ধারায় এই সকল অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত শক্তিগুলির প্রভাবও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। "বৈঠকে" বিনয় সরকার বলেছেন: "কল্পনায় বস্তুনিষ্ঠা চালানো উচিত; কিন্তু আবার একমাত্র বস্তুনিষ্ঠার উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। বস্তুতঃ মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে বর্তমান অবস্থা দেখে' ভবিষ্যৎ ঠাওরাতে বসা অনেক সময়ে নেহাৎ দুঃসাহসের কাজ। আর অতীতের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোষ্ঠী তৈরী করা তো বিলকুল আহাম্মুকি। বস্তুনিষ্ঠার সীমা আছে। প্রতি মুহূর্তেই মানুষের জীবনে নতুন-নতুন লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। নয়া নয়া চরিত্র যখন-তখন নরনারীর ব্যক্তিত্বের ভেতর ফুটে উঠ্‌তে পারে। অধিকন্তু চার-দিক্‌কার আবহাওয়া হামেশা বদ্‌লে যাচ্ছে। তার ফলে নয়া-নয়া সুযোগ-সুবিধা এসে জুট্‌ছে প্রত্যেক নরনারীর দুয়ারে! এই কারণেই দুনিয়ার সর্বত্র আজকের পারিয়া কাল হয়েছে ব্রাহ্মণে পরিণত। আজকের গরীবের হাতে কাল এসেছে ধনসম্পদ। আজকের কাপুরুষ কাল হয়েছে গুণ্ডা। আজকে যে গুণ্ডা কাল সে সেনাপতি। জীবন-বিকাশের কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। সংসার চলে আঁকা-বাঁকা পথে। এই সব অনিশ্চিত শক্তি ও সুযোগগুলা বস্তুনিষ্ঠার সংখ্যাশাস্ত্রে পাকড়াও করা যায় না। অথচ এই সব চিজ বর্জন করলে কল্পনাটা

নেহাৎ হাল্কা হয়ে যেতে বাধ্য।" তাই বর্তমানের অবস্থা দেখে ভবিষ্যৎ কল্পনা করবার সময় "অনিশ্চিত, অজ্ঞাত, অপরিচিত শক্তি ও সুযোগ-গুলার দিকে সর্বদাই নজর রাখা উচিত"। বিনয় সরকার বলেন, "আমার অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আর অপরিচিত শক্তি ও সুযোগ শব্দে দৈব, বরাত্, ভাগ্য, ভগবৎ-কৃপা বুঝ্তে হবে না। অনিশ্চিত, অপরিচিত, অজ্ঞাত ইত্যাদি সুযোগ-শক্তিগুলাও মানুষেরই সৃষ্টি। এই সব মানুষের সজ্ঞান ক্রিয়ার ফল। একসংগে নানা লোক নানা কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরণের কাজ করে চলেছে। এই রকমারি কাজগুলা হয়ত পরস্পর-সংযুক্ত নয়। ঘটনাচক্রে একজন কর্মী অপর কর্মী অথবা তার কর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিব্-হাল নয়।··· সর্বদাই যে-কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকা যুক্তিসংগত। তবে বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্তমানের অবস্থাটা সম্বন্ধে সজাগ থাকা কর্তব্য। আমি বস্তুও ছাড়ি না, অনিশ্চিতও ছাড়ি না"* (৫)। বিনয় সরকারের ইতিহাস-দর্শনে ও ভবিষ্যনিষ্ঠায় অনিশ্চিত, অজ্ঞাত ও অপরিচিত সুযোগ ও শক্তির প্রভাব স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়। ১৯১১-১২ সনের ইতিহাস গ্রন্থেও এ সুর পরিষ্কার।

পঞ্চমত, বিনয় সরকারের ইতিহাস-বিশ্লেষণের আর এক মস্ত বড় বিশেষত্ব বহুত্বনিষ্ঠ (pluralism) দর্শনের ব্যাপক প্রয়োগ। তাঁর ইতিহাস-দর্শন অদ্বৈতবাদের (monism-এর) ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, মানুষ বহুত্বনিষ্ঠ জীব—তার রক্তের কণায় কণায় বহুত্বনিষ্ঠার সুর ঝংকৃত। ইতিহাসের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায় (monistic interpretation এ) তাই তিনি কখনো সায় দিতে প্রস্তুত নন। অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা মাত্রেই বুজরুকি, এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত। হেগেল, মার্কস, ডুর্কহাইম, বাকল প্রচারিত ইতিহাসের ভাববাদী, বস্তুবাদী, সমাজবাদী ও ভৌগোলিক ব্যাখ্যাকে তিনি বহুলাংশে অসম্পূর্ণ বা

* (৫) বিনয় সরকারের বৈঠকে (২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ১৯৪৪, পৃঃ ৪২৩-৪২৮)।



ভ্রমাত্মক বিবেচনা করেছেন* (৬)। এক কথায় এঁরা সকলেই কমবেশী অদ্বৈতবাদী বিশ্লেষণ-প্রণালীর ব্যাখ্যাকর্তা ও প্রচারক। পক্ষান্তরে বিনয়কুমার ছিলেন "বহুত্বনিষ্ঠ" দর্শনের সেবক ও প্রতিনিধি। ইতিহাসের ধারায় তিনি একই সংগে আর্থিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মীয়, যৌন ইত্যাদি রকমারি শক্তির প্রকাশ ও প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনি একদিকে যেমন ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ বলে বর্জন করেছেন, তেমনি আবার জাতিতাত্ত্বিক বা ভৌগোলিক ব্যাখ্যাকেও ভ্রমাত্মক বলে বাতিল করেছেন* (৭)। ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে আর্থিক শক্তি বা জাতি-তাত্ত্বিক শক্তি একটা প্রকাণ্ড শক্তি বটে, কিন্তু অন্যান্য শক্তির প্রভাবও সেইসংগে স্বীকার্য। বিনয়কুমারের মতে রকমারি শক্তি একই সংগে বা পাশাপাশি মানবজীবনে বা সভ্যতার বিকাশে বিভিন্ন মাত্রায় কাজ করে চলে। তাছাড়া, পারিপার্শ্বিক বা সামাজিক পরিবেশের রকমারি প্রভাব স্বীকার করার পরেও তিনি ইতিহাসের ভাঙা-গড়ায় ব্যক্তিত্বের স্বরাজ, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, তার আদর্শবাদ ও সৃষ্টিমূলক

* (৬) বর্তমান লেখকের "ঐতিহাসিক আলোচনায় নূতন দৃষ্টি" (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫৩) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

* (৭) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাক্‌ল (Buckle) ইতিহাসের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তৎকালে জাতিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও খুব প্রচলিত ছিল। জাতিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অর্থ এই যে, কতকগুলি জাতি (races) স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি সদ্‌গুণের অধিকারী হয়ে থাকে, আর কতকগুলি জাতি সেগুলিকে আয়ত্ত করতে পারে না। কারণ প্রত্যেক রেসের সমান যোগ্যতা অর্জনের স্বাভাবিক অধিকার নেই। আমাদের দেশে বঙ্কিম এক সময় ইতিহাসের এই ভৌগোলিক ও জাতিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রচার করেছিলেন। বিনয় সরকারের মতে উভয়বিধ ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। একালে ইংরেজ ঐতিহাসিক টয়েন্‌বিও সভ্যতার অদ্বৈতবাদী জাতিতাত্ত্বিক (monocratically ethnocentric) ব্যাখ্যার বিরোধী।

চাঞ্চল্য ( creative disequilibrium ) ইত্যাদি বস্তুর যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের দেশে ইতিহাসের "বহুত্বনিষ্ঠ" ব্যাখ্যা-প্রণালীর প্রবর্তক হিসাবে বিনয় সরকার বস্তুতই স্মরণীয়। তাঁর "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" রচনায়ও এই সব কথা সূত্রাকারে পাওয়া যায়। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যে এই বহুত্বনিষ্ঠ ( pluralist ) ব্যাখ্যা-প্রণালীর সজ্ঞান ও শৃঙ্খলানিষ্ঠ প্রয়োগ সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ইতিহাস-দর্শনের ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলানিষ্ঠ গড়নের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর "দি ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ্ সোশ্যাল পার্টার্ণস্" ( কলিকাতা, ১৯৪১, পৃঃ ৭০৪ ) নামক বিরাট গ্রন্থে।

## "হিন্দু সমাজ-তন্ত্রের বাস্তব ভিত্তি"

বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চার এক অক্ষয় কীর্তি তাঁর "হিন্দু সমাজতন্ত্রের বাস্তব ভিত্তি" বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ। ১৯১০-১১ সনে তিনি এলাহাবাদে মেজর বামনদাস বসু ও তাঁর দাদা জজ শ্রীশ বসুর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন ও পরবর্তী তিন বছর ঐস্থানের পাণিনি আফিসে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। মেজর বসুর প্রস্তাবেই তিনি সংস্কৃত "শুক্রনীতি" গ্রন্থখানির ইংরেজী অনুবাদ করেন ( ১৯১১-১৩ )। ১৯১৪ সনে ঐ অনুবাদ-গ্রন্থ বিশদ টীকা-টিপ্পনী সহ এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯০৫ সনে আবিষ্কৃত কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থখানি ১৯০৯ সনে শ্যামাশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বাজারে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ গ্রন্থের আবিষ্কার প্রাচীন ভারত-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এক অতি-উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিনয়কুমার কর্তৃক "শুক্রনীতি"র ইংরেজী তর্জমা প্রকাশও ঐরূপ আর এক স্মরণীয় কীর্তি। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র



তুলনায় শুক্রাচার্যের "নীতিসার" গ্রন্থ অনেক হালের রচনা; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের যে চিত্র "শুক্রনীতি"র ভিতর প্রকটিত হয়েছে, অর্থশাস্ত্রের তুলনায় তার ব্যাপকতা অনেক বেশী *(৮)। "শুক্রনীতি"র তর্জমা ও সম্পাদনা বিনয়কুমারের নিজ জীবনে এক দস্তুরমত আত্মিক বিপ্লব আনয়ন করে। "শুক্রনীতি"র তর্জমাকালে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির গড়ন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন নতুন আলোর সন্ধান পান—তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে থাকেন যে, প্রাচীনকালে হিন্দুজাতি শুধু আধ্যাত্মিকতার মোহে মসগুল হ'য়ে থাকতো না, শক্তি-যোগের ও সংসারধর্মের সাধনাও তার জীবনের এক প্রধান ধান্ধা ছিল। তাঁর নিজের ভাষা উদ্ধৃত করেই বলি: "সেই শুক্রনীতি তর্জমার যুগে ( ১৯১১-১৩ ) ফিরে যাচ্ছি। ভারতীয় সংস্কৃতির এক নয়া মূর্তি আমার নজরে জোরের সহিত দেখা দিতে সুরু করেছিল। সে হচ্ছে সমরনিষ্ঠ, সংসারনিষ্ঠ, রাষ্ট্রনিষ্ঠ, হিংসানিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ ভারত। তার পাশে নিবেদিতা-প্রচারিত ভারতমূর্তি অতি-কাল্পনিক, অতি-অলীক, অতি-ভাবনিষ্ঠ, অতি-আদর্শনিষ্ঠ মনে হচ্ছিল। অর্থাৎ হিন্দু-সংস্কৃতি-বিষয়ক নিবেদিতা-প্রচারিত ব্যাখ্যাগুলাকে আমি ডন সোসাইটীর চিন্তাধারা, ব্রহ্মবান্ধবের বাণী, রবীন্দ্র-সাহিত্য ইত্যাদির মতন প্রায় একই দরের ভেবেছি। সবই এক সংগে বর্জনও করেছি। এই সুপরিচিত ধারার প্রভাবে প্রাচ্য-গৌরব উজ্জ্বল আকারে দেখা দেয়। আর বুকটাও বেশ কিছু ফুলে উঠে; কিন্তু ব্যাখ্যাগুলা অনেকটা তথ্যহীন ও বস্তুহীন।" কিন্তু তাই বলে "আজ পর্যন্ত এই চারজনের একজনকেও

*( ৮ ) See R. G. Pradhan's paper on "The Notion of Kingship in the Shukraniti" as published in the *Modern Review* for Feb., 1916, pp. 152-162. ঐ প্রবন্ধে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেকার রচনা বলে "শুক্রনীতি" উল্লেখ করা হয়েছে।

আমার পূজাস্থান হ'তে একচুলও নামাইনি। মত-পথের অমিল থাকা সত্ত্বেও কোনো বীরকে আমি অবীর বিবেচনা করি না। আমি এঁদের সকলেরই চেলা"* (৯)।

ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুপ্রচলিত মতবাদের প্রতি এইভাবে শুক্রনীতির পর্যালোচনা বিনয় সরকারের মনে এক তীব্র সংশয় সৃষ্টি করে। গভীরতর অনুসন্ধানের ফলে তিনি স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয় মনোবৃত্তি আর ইয়োরোপীয় মনোবৃত্তি আসলে অভিন্ন। "ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ, ততখানি যুদ্ধপ্রিয়, ততখানি শক্তিযোগী, ততখানি সাম্রাজ্যবাদী, যতখানি ইউরোপ। আবার ইয়োরোপ ততখানি নীতিনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক বা ঐ ধরণের আর কিছু, যতখানি ভারতবর্ষ। সাধারণত প্রচার করা হয় যে, ভারতবর্ষ অহিংসার দেশ, কিন্তু আমার মতে তার হিংসানীতি জবরদস্ত, এবং যুদ্ধনিষ্ঠা, রাজ্যলিপ্সা ইত্যাদি চিজও অত্যন্ত ভীষণ" (বৈঠকে, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৩৭)। এই মতবাদ বিনয়কুমার প্রথম প্রচার করেন তাঁর "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি" গ্রন্থে। এর প্রথম খণ্ড বের হয় ১৯১৪ সনে আর চতুর্থ খণ্ড ১৯৩৭ সনে। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই মহাবিশাল গ্রন্থে হিন্দু-জাতির সংসারনিষ্ঠ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, লড়াইদক্ষ, শক্তিযোগী মূর্তি জ্বল্-জ্বল্ করছে। ভারতবর্ষ মূলত আধ্যাত্মিকতা ও পরলোক-চর্চার দেশ,—দেশী-বিদেশী ভারততত্ত্বজ্ঞদের প্রচারিত ও সুপ্রচলিত এই ইতিহাস-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বিনয়কুমারের ঐ গ্রন্থ এক বিরাট প্রতিবাদ বিশেষ।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ তাঁর "অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া"-য় (১৯২৩এর সংস্করণ, পৃঃ ৯৩) "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড" গ্রন্থকে

* (৯) বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯২।



মূল্যবান বলে ঘোষণা করেছেন, যদিও বইয়ের নামকরণ সম্বন্ধে তিনিই আবার বলেছেন "ক্রাম্‌ব্রাস টাইটেল"। গ্রন্থের নামকরণের প্রথমেই "পজিটিভ্" শব্দের ব্যবহার থাকায় অর্থ বুঝতে তাঁর মতো পণ্ডিতকেও যে এতখানি বেগ পেতে হবে তা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। "পজিটিভ্" শব্দটা ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত্ ক্যঁতের মার্কামারা পারিভাষিক। ক্যঁৎ-দর্শনে "পজিটিভ্" শব্দের অর্থ সংসারনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ বা জাগতিক অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, পারলৌকিক শব্দের ঠিক উল্টো। "শুক্র-নীতি"র তর্জমা ও "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ডে" তার বিপুল ব্যাখ্যা বিনয়কুমারের প্রাচীন ভারত-বিষয়ক গবেষণার এক অক্ষয় কীর্তি। শুক্রনীতির অনুবাদ গ্রন্থখানি দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়ে থাকে। ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর "পোলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এন্‌শেণ্ট ইণ্ডিয়া", ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসুর "সোশ্যাল অ্যাণ্ড রুর্যাল ইকনমি অব নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া", ডক্টর সালিটরের "সোশ্যাল অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল লাইফ ইন দি বিজয়নগর এম্পায়ার" প্রভৃতি পুস্তকে শুক্রনীতির তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকেও ঐ গ্রন্থের তারিফ করতে শুনেছি। ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান লেখককে বলেন যে, "আমার Iconography-বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে বিনয়বাবুর শুক্রনীতি-বিষয়ক বইখানি আমাকে খুব সাহায্য করেছে।" বিদেশী ভারততত্ত্বজ্ঞদের ভেতর জার্মাণ পণ্ডিত জে. জে. মায়ার ও ফরাসী পণ্ডিত লুই রেণো ঐ অনুবাদ গ্রন্থখানির বিশেষ সমাদর করে থাকেন * (১০)। "শুক্রনীতি"র ভেতর প্রাচীন হিন্দুজাতির বস্তুনিষ্ঠ ও সংসারনিষ্ঠ জীবনধারা অতি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। এই গ্রন্থের যে মহাভাষ্য তিনি রচনা করেছেন—যা

* (১০) Vide : Louis Renou's paper on "France and India" (Eur-Asia, March, 1949).



1,51,831

JADAVPUR UNIVERSITY

"পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি" নামে পরিচিত—তা দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষকদের ভেতর জার্মাণ পণ্ডিত ভিণ্টারনিট্স্, যোলি, হিল্লেব্রাণ্ট ও মায়ার, ফরাসী পণ্ডিত মাসসন্-উর্সেল, ইংরেজ পণ্ডিত কিথ্ ও টমাস্ এই বই নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থের তথ্য মার্কিণ সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন, বার্ণস্ ও বেক্কার কর্তৃক তাঁদের একাধিক গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক-শাস্ত্রী স্যার গিলবার্ট মারে এই বই পড়ে লিখেছিলেন : "Not only full of learning but full of points that may throw light on the problems of my own studies" অর্থাৎ "বইখানা শুধু যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তা নয়, এর ভেতর এমন অনেক বিষয় আছে যা আমার নিজ গবেষণার উপরও নতুন আলোক-সম্পাত করতে পারে।" বিলাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ্ ম্যারেট বলেছেন : "এই বইখানি নৃতত্ত্বশাস্ত্রীর কাছে চরম ধরণের মূল্যবান" ("It will be of the very greatest value to an anthropologist")। ভারতীয় গবেষক-মহলেও উক্ত গ্রন্থের প্রভাব সুপরিস্ফুট। ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ডেভেলাপমেণ্ট অব হিন্দু পলিটি" (১৯৩৯) গ্রন্থের তথ্য-বিশ্লেষণে বিনয় সরকারী প্রভাব স্পষ্ট। কালিদাস মুখোপাধ্যায় ও রণজিৎ সেনগুপ্তের "অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা" পুস্তকে (১৯৪১) ও অধ্যাপক অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হিন্দু সভ্যতার ঐতিহাসিক রূপ" নামক সুদীর্ঘ রচনায় (সোনার বাংলা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৪২) বিনয় সরকারী চিন্তাধারার সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট ধ্বনি শুনতে পাই। ১৯২৮ সনে মেজর বামনদাস বসু লিখেছিলেন যে, অধুনাকালে প্রাচীন ভারতীয় সংসারনিষ্ঠা বা পজিটিভিজমের সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে যে গবেষণা-প্রবণতা লক্ষ্য করা



যায়, তার সূত্রপাত করেন "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড" গ্রন্থে বিনয় সরকার (১৯১৪)। ১৯৪৮ সনে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে বক্তৃতাপ্রসংগে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, প্রাচীন হিন্দুজাতির সাংসারিক ও জাগতিক ধারা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্রে "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড" গ্রন্থের লেখক বিনয় সরকার পথ-প্রদর্শক।

এই গ্রন্থের শেষ খণ্ডের নাম "ইনট্রোডাকশান টু হিন্দু পজিটিভিজম্" (১৯৩৭, পৃঃ ৭৭০)। একজন বিশিষ্ট ফরাসী মনীষী এই গ্রন্থের সমালোচনাকালে ফরাসী পত্রিকায় লিখেছেন : "এইটেই হচ্ছে বিনয় সরকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা ও সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারার একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে সুপরিচিত। ডক্টর বিনয়কুমার সরকার ঠিক যেন একটা বিশ্বকোষ। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মাণ এবং ইতালিয়ান ভাষায় তাঁর লেখা সুবিস্তর। আর তিনি বহুসংখ্যক বিভিন্ন বিষয় সম্পূর্ণ নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আলোচনা করতে অভ্যস্ত। পাশ্চাত্যবাসিগণ যদি সমাজ-বিজ্ঞানে বর্তমান ভারতকে সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে চায়, তবে এই বইখানি অপরিহার্য।" এই মনীষী হচ্ছেন মঁসিয় জাঁ আল্‌বেয়ার। ইনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ'র গ্রন্থাবলী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে পাশ্চাত্য জগতে ও ভারতের সুধীমহলে পরিচিত। এই ব্যক্তি বিনয় সরকারের উল্লিখিত গ্রন্থের ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় সত্বর অনুবাদের জন্য ফরাসী পত্রিকা মারফৎ পাশ্চাত্যবাসীর কাছে আবেদন জানান।

## চীনা, জাপানী ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় সমালোচনা

১৯১৪ সনে প্রকাশিত "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিনয় সরকার ভারতীয় ইতিহাসের যে দর্শন প্রচার করেন, তার

তুলনামূলক ব্যাপক প্রয়োগ দেখতে পাই লেখকের "চাইনিজ রিলিজিয়ান থ্রু হিন্দু আইজ্" (সাংহাই, ১৯১৬, পৃঃ ৩৫৩) গ্রন্থে। এই গ্রন্থের উৎপত্তি হয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর উত্তর চীন শাখায় লেখকের প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতা থেকে। গ্রন্থের নামকরণে "রিলিজিয়ান" শব্দের প্রয়োগ দেখে সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে বইটা শুধু ধর্ম-বিষয়ক আলোচনার বই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বইয়ের মূল আলোচ্য বস্তু হলো ভারতীয়, চীনা ও জাপানী সভ্যতার গড়নের তুলনায় সমালোচনা ও "এশিয়াটিক"*(১১) মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ। ডিকিন্‌সন ও হানটিংটন প্রচারিত যে ইতিহাস-দর্শন তার উপর এই বইখানি চাবুক বিশেষ। বইখানি বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভূমিকায় লেখক বলেছেন: "Neither historically nor philosophically does Asiatic mentality differ from the Eur-American. It is only after the brilliant successes of a fraction of mankind subsequent to the Industrial Revolution of the last century that the alleged difference between the two mentalities has been first stated and since then grossly

* (১১) ১৯১৬।১৯১৭ সনেও বিনয় সরকার তাঁর রচনায় "এশিয়াটিক" পরিভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন; কিন্তু তৎপরবর্তী সকল রচনায় এই পরিভাষা বর্জন করে "এশিয়ান" পরিভাষা কায়েম করেন। পাশ্চাত্যদেশে পর্যটন কালে (১৯১৪-২৫) তিনি ও আরও কয়েকজন ভারতীয় মনীষী উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্যবাসীরা "এশিয়াটিক" শব্দ অনেকটা contemptuous term হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। তাই তৎপরিবর্তে "এশিয়ান" পরিভাষা কায়েম করা হয়। টোকিও থেকে তৎকালে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রকাশিত "Asian Review" পত্রিকা এর আরেক বাস্তব সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৪৮ সনে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়াবাসীদের সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক "এশিয়াটিক" শব্দের বদলে "এশিয়ান" পরিভাষা প্রয়োগ-বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়।



exaggerated. At the present day science is being vitiated by pseudo-scientific theories or fancies regarding race, religion and culture. Such theories were unknown to the world down to the second or third decade of the 19th century."

বিনয়কুমারের বক্তব্য হলো এই যে, শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি ও জীবন-দর্শনের দিক থেকে এশিয়াবাসী ও ইউরোপবাসীর মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। আর শিল্পবিপ্লবের পরে এশিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যে যে পার্থক্য বিপুলভাবে দেখা দেয়, তা অনেকটা কৃত্রিম ও অ-গভীর। এই পার্থক্যও আবার ভারতের ও এশিয়ার শিল্প-বাণিজ্য ও আধুনিক সভ্যতার দিকে অগ্রগমনের সংগে-সংগে বিলুপ্ত হতে বাধ্য। অর্থাৎ এশিয়া ও ইয়োরোপের জীবনে বর্তমানে যে পার্থক্য সহজেই মালুম হয়, তা সময়গত ব্যবধানের পরিণতি, গভীর মনস্তত্ত্বমূলক বৈষম্যের পরিচায়ক নয়। বিষয়টা আরও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা যাক।

বিনয় সরকারের মতে সভ্যতার পথে পুবও নাই, পশ্চিমও নাই। একথা আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার দিক থেকেও সত্য, আবার অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও বাস্তব কীর্তির দিক থেকেও সত্য * (১২)। অষ্টাদশ

* (১২) ভারতীয় সুকুমার শিল্পে (চিত্র ও ভাস্কর্যে) ও সৌন্দর্য-তত্ত্বে বিশ্বজনীনতা ও মানবনিষ্ঠার দিক বিনয়কুমার তাঁর বহু রচনায় বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর খুব বড় আলোচনা "The Aesthetics of Young India"নামে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী-সম্পাদিত "রূপম্" (Rupam) ত্রৈমাসিকে ১৯২২ সনে মুদ্রিত হয়। ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সনের ভেতর তাঁর আরও অনেকগুলি রচনা ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়। সুপ্রচলিত শিল্প-দর্শনে বলা হতো যে শিল্পের প্রেরণা ও লক্ষ্য ভারতে একরূপ আর ইয়োরোপে অন্যরূপ। তার বিরুদ্ধে বিনয়কুমার প্রচার করেন "শিল্পীরা ছবি আঁকে, গান গায়, মূর্তি গড়ে,—

শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম মূলগতভাবে পৃথক্ ছিল না ; বরং দুই মহাদেশে সভ্যতা মোটের উপর একই ধারায় ধাপে-ধাপে বিবর্তিত, বিকশিত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমের বুকে ধীরে-ধীরে দেখা দেয় শিল্প-বিপ্লব। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পশ্চিম দ্রুতগতিতে নয়া সভ্যতার পথে এগিয়ে চলে। সেসময় থেকেই পূর্ব-পশ্চিমের ফারাকটা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে পশ্চিম চলে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে, আর ঠিক সে-সময়েই প্রাচ্য থাকে শোচনীয়ভাবে পিছিয়ে পড়ে। দুই জগৎ—পূর্ব ও পশ্চিম—সত্য সত্যই তখন পৃথক্ হয়ে গেলো। একদিকে পশ্চিমের জীবন-বিকাশে দ্রুত অগ্রগমন, আর অন্যদিকে পূর্বের জীবনে ব্যর্থতার বিপর্যয়,—দুই-ই একই যুগের ঘটনা ( ১৭৫৭-১৯০৫ )। ১৭৫৭ থেকে পৃথিবীর যে ইতিহাস তা সংক্ষেপে হলো অগ্রসরশীল পশ্চিমের কাছে পিছিয়ে-পড়া প্রাচ্যের পরাজয় ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী। পূর্ব-পশ্চিমের পার্থক্য এই সময় সমস্ত ইতিহাসের ধারায় প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এই সময় পশ্চিমা জাতিগুলি পিছিয়ে-পড়া প্রাচ্যের বুকে সজোরে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক দিগ্বিজয় চালাতে থাকে। পশ্চিমের প্রচণ্ড আঘাতে প্রাচ্যের

হিন্দু হিসাবে নয়, খৃষ্টিয়ান হিসাবে নয়, এশিয়ান হিসাবে নয়, মুসলমান হিসাবে নয়, পশ্চিমা হিসাবে নয়—মানুষ হিসাবে। শিল্প-জগৎ মানুষের সৃষ্ট জগৎ। এটা প্রাকৃতিক জগৎ হ'তে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জগৎ। ছবিগুলা, মূর্তিগুলা, সুরগুলা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আওয়াজ-সমূহের নকল মাত্র নয়। এই সব হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি-শক্তির বিলাস। এই সৃষ্টি-কার্যে পূর্বী-পশ্চিমা প্রভেদ নাই। আছে স্রষ্টার সৃষ্টি-ক্ষমতার উনিশ-বিশ, ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ ইত্যাদি বিষয়ক প্রভেদ।" এই সব মতামত তিনি তাঁর "দি এস্‌থেটিক্‌স্ অব ইয়ং ইণ্ডিয়া" ( যুবক ভারতের সৌন্দর্যতত্ত্ব, ১৯২৩, পৃঃ ১২৪ ) গ্রন্থে আরও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন। এই প্রসংগে তাঁর "হিন্দু আর্ট : ইট্‌স্ হিউম্যানিজম্ অ্যাণ্ড মডার্ণিজম্" গ্রন্থখানিও পঠিতব্য।



রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। পশ্চিমা জাতিগুলি শক্তিমদোন্মত্ত ও বিজয়সুলভ মনোবৃত্তিতে প্রাচ্যের জীবনে ও সভ্যতার গড়নে আবিষ্কার করলো এক গভীর অসাম্য, বৈষম্য ও পার্থক্য। বর্তমানের হীন ও অধঃপতিত অবস্থার ভেতর তারা অবলোকন করলো প্রাচ্য সমাজের স্বাভাবিক, ঐতিহাসিক রূপ। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে জার্মাণ দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) তাঁর "ইতিহাস দর্শন" গ্রন্থে ( ১৮২৫ ) প্রচার করেন যে, প্রাচ্যদেশের শাসননীতি ধর্ম-তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত, আর সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড হলো স্বৈরাচার ও অত্যাচারের লীলাভূমি (scene of despotism)। ফরাসী পণ্ডিত কুঁজা (Cousin, ১৭৯২-১৮৬৭) তাঁর "দর্শনের ইতিহাস" পুস্তকে ঐ সময়ই ব্যক্ত করেন যে, প্রাচ্যদেশের সবকিছুই,—শিল্প, বাণিজ্য, আইননীতি,—স্থাণুবৎ বা নিশ্চল। এর পর ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী পণ্ডিত গবিন্যো (Gobineau, ১৮১৬-৮২ ) ১৮৫৩-৫৫ সনে শ্বেতাংগ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। জাতিতাত্ত্বিক গোঁড়ামির আর এক বড় প্রতিনিধি হলেন ইংরেজ মনীষী বাক্‌ল (Buckle, ১৮২১-৬২ )। তাঁর মতে পূর্ব পশ্চিম থেকে আলাদা ; গ্রীক চরিত্র ভারতীয় চরিত্র থেকে পৃথক্। আর এই পার্থক্যের মূলে তিনি আবিষ্কার করেছেন ভূগোলের প্রভাব। ১৮৫৭ সনে তাঁর এই মত প্রচারিত হয়। অষ্টম দশকে নৃতত্ত্ববিদ্ মেইন (Maine, ১৮২২-১৮৮৮) তাঁর নানা গ্রন্থে প্রচার করেন যে, প্রাচ্যদেশের সমাজ-ব্যবস্থা অত্যাচার (despotism)-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ১৮৮৩ সনে বাহির হয় ইংরেজ ঐতিহাসিক সিলি-র (Seeley) "Expansion of England" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ। জাতিতাত্ত্বিক বিদ্বেষ এই গ্রন্থে পরিস্ফুট *(১৩)।

*(১৩) See B. K. Sarkar's *Political Philosophies Since 1905*, Vol. I (Madras, 1928, pp. 29, 51, 104 and 105-108.)

পশ্চিমের ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের সংগে সংগে এই অভিনব দর্শন প্রকটভাবে দেখা দেয়। এই দর্শনের অন্যতম প্রধান প্রচারক হলেন জার্মাণ পণ্ডিত ম্যাক্স্ মিলার (Max Müller)। ১৮৮৩ সনে প্রকাশিত হয় "ইণ্ডিয়া : হোয়াট্ ক্যান ইট্ টিচ্ আস ?" (India : What Can It Teach Us ?) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে বিনয় সরকার "Bible of chauvinism and race-dogmatism" বলে চিহ্নিত করেছেন *(১৪)। এই গ্রন্থে পূর্ব-পশ্চিমের সভ্যতার গঠনে, সংস্কৃতি-বিকাশে, আদর্শে ও প্রকৃতিতে এক মূল পার্থক্য জোরের সহিত ঘোষিত হয়। সে পার্থক্য হলো : প্রাচ্য জীবনের কেন্দ্রস্থলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, আর প্রতীচ্য জীবনের প্রধান বস্তু

*(১৪) "In it is concentrated the conventional philosophy of civilization that the logic of the 'white man's burden' has found it reasonable to propagate through philologists and mythologists. He (Max Müller) is to a great extent responsible for the absurdities and non-sensical ideas that have become ingrained in the consciousness of Orientalists and through them, of sociologists, culture-historians, philosophers and statesmen in regard to the alleged absence of manly, energistic, rationalizing, political and economic features in Hindu civilization and history. His work has helped *orientalisme* indology and the study of things Asian to function as a handmaid to the purposes of Western colonialists and Empire-builders in the East—by furnishing them with a gospel as to the innate disqualifications of the Orientals (Indians) for economic energism and political self-assertion."—*Political Philosophies Since 1905*, Vol I., pp. 105-106.



সংসারনিষ্ঠা ও বস্তুতান্ত্রিকতা। ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থ দ্বারা কলুষিত এই জীবন-দর্শন পশ্চিমা পণ্ডিতেরা তার পর থেকে বার বার বিভিন্ন সুরে ও ভাষায় ঘোষণা করেন। ফলে পশ্চিম থেকে আমদানী-করা ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও দর্শনের মারফৎ এই বৈষম্যের মন্ত্র জগতের সর্বত্র প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সেই প্রচারের ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে ভারতের (ও প্রাচ্যের) যে মূর্তি দাঁড়িয়ে গেলো তা হলো নিম্নরূপ : "ভারতবর্ষ ব্যবহারিক বিজ্ঞানে, যুক্তিনিষ্ঠায়, অর্থ-নীতিতে, রাজনীতিতে, সমর-বিদ্যায়, বস্তুনিষ্ঠায় একদম আনাড়ি। সুতরাং ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের গোলাম হ'য়ে থাকবার যোগ্য।" বিনয় সরকার "বৈঠকে" বলেছেন : "ভারতের অনেকে মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের যাঁরা ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিকতার দেশ বলে প্রচার করেছেন, তাঁরাই ভারতবর্ষকে যথার্থরূপে বুঝেছেন। শুনা যায় যে, ভারতের নরনারী সম্বন্ধে আধ্যাত্মিকতার দাবী প্রচার করলে ভারতীয় পণ্ডিতেরা নাকি বিলাতে বেশ-কিছু ইজ্জদ পেয়ে থাকেন? তাতে তাঁদের সাংসারিক লাভও বোধ হয় ঘটে ভালই। ভারতের নরনারী রক্তমাংসের মানুষ ছিল না,—এই কথাটা সাদা চামড়ার সুধী ও রাষ্ট্রিকবর্গ ভারত-সন্তানের মুখে শুন্‌লে আহ্লাদে আটখানা হন। তাঁরা এই ধরণের ভারত-প্রচারককে খুব তারিফ করেন। সেই তারিফের জোরে মোটা মোটা অনেক কিছু হওয়া বা পাওয়া সম্ভব" ("বৈঠকে", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ আমাদের দেশী পণ্ডিতদেরও অনেকেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-বিষয়ক সমস্যা বিশ্লেষণে ম্যাক্স্ মিলারের মতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সায় দিয়ে চলেছেন। পশ্চিম থেকে প্রচার-করা প্রাচ্যের জীবন-ব্যাখ্যা আমরা এক হতচেতন মুহূর্তে,—রাষ্ট্রিক পরাজয় ও ভাগ্য-বিপর্যয়ের যুগে— সত্য বলে স্বীকার করে নেই। আর সেই মন্ত্রই,—পশ্চিমের আদর্শ পূর্বের আদর্শ থেকে আলাদা এই দর্শন,—ধীরে ধীরে

আমাদের চিন্তায় প্রথম স্বীকার্য (first postulate in thinking) বলে গৃহীত হয়।

বিনয় সরকারই বোধ হয় সর্বপ্রথম মনীষী, যিনি প্রাচ্য সম্বন্ধে পশ্চিম-প্রচারিত এই জীবন-ব্যাখ্যার ও সভ্যতা-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বড় আকারে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছেন * (১৫)। তিনি বলেন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আপাতদৃশ্য ফারাক্‌টা শিল্প-বিপ্লবের পরে ও ফলে সৃষ্ট। আর্থিক ও সামাজিক বিবর্তনের উঁচু-নীচু ধাপে অসমানভাবে অবস্থিত দুই মহাদেশের,—ইয়োরোপ ও এশিয়ার,—জীবন-গঠনে যে পার্থক্য বর্তমানে অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে পরিলক্ষিত হয়, তা নিতান্তই সাময়িক ঘটনা মাত্র—শুধু সাময়িক নয়, অনেকখানি কৃত্রিমও। শিল্প-বিপ্লবের পথে ভারতের ও এশিয়ার অগ্রগমনের সংগে সংগে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভেতর বর্তমানকালীন পার্থক্য ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে। ১৯০৫ সন থেকে এশিয়ার সে অগ্রগমন মন্থরগতিতে আরম্ভ হয়। রাশিয়ার উপর জাপানের বিজয়লাভ ও ভারতে "গৌরবময় বংগ-বিপ্লবের" ঘোষণা এশিয়ার ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভেতর আপাতদৃশ্য যে পার্থক্য ঐ সময় থেকে ক্রমশই বিলুপ্তির পথে। জীবন-বিকাশে বা সভ্যতার বিবর্তনে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈষম্য বিদ্যমান ছিল, তা আজ ১৯৫৭ সনে বহুলাংশে অবলুপ্ত। তথাকথিত পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী, পশ্চিমা জীবনভঙ্গী, পশ্চিমা জীবনাদর্শ, পশ্চিমা জীবনবেদ, পশ্চিমা বস্তুনিষ্ঠা ও সংসারনিষ্ঠা ইতিমধ্যেই ভারতে ও এশিয়ার বিভিন্ন জনপদে নরনারীর জীবনে সুস্পষ্টরূপে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিনয় সরকার "দি চাইনিজ রিলিজিয়ান থ্রু হিন্দু আইজ" গ্রন্থে (১৯১৬) বিশ্লেষণ করে

* (১৫) See H. Mukherjee's article entitled *An Indian Thinker* as published in the *Statesman*, 8th January, 1950.



দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি আর পূর্ব মনোবৃত্তি মোটের উপর অভিন্ন * (১৬)। প্রাচ্য পশ্চিম থেকে বেশী নীতিনিষ্ঠ, বেশী ধর্মপ্রবণ, বেশী আধ্যাত্মিক এই ধারণা ভুল। আবার পশ্চিম প্রাচ্য থেকে বেশী সংসারনিষ্ঠ, বেশী ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ, বেশী ভোগনিষ্ঠ এই বিশ্বাসও ভ্রমাত্মক। একান্তভাবে যাঁরা চীন-বিশেষজ্ঞ ও জাপান-বিশেষজ্ঞ তাঁরাও এই বইয়ের ভেতর নতুন নতুন দৃষ্টির সন্ধান পাবেন।

## "যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা"

এ বিষয়ে বিনয় সরকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" (লাইপৎসিগ, ১৯২২, পৃঃ ৪১০)। দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সনে "দি সোশিওলজি অব রেসেস্, কালচারস্ অ্যাণ্ড হিউম্যান প্রোগ্রেস্" অর্থাৎ "জাতি, সংস্কৃতি ও মানবোন্নতির সমাজশাস্ত্র" নামে। দুই সংস্করণে বইয়ের নাম পৃথক্ থাকলেও আলোচ্য বিষয়বস্তু উভয়ক্ষেত্রেই পুরাপুরি এক। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক, বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্রে

* (১৬) প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে মূলগত সাম্য, সাদৃশ্য বা ঐক্য আবিষ্কার করার দিক থেকে জার্মাণ কবিবর গ্যেটে অন্যতম অগ্রণী মনীষী। বিনয় সরকার লিখেছেন: "Goethe was one of the very first to discover the fundamental identity between India and Europe." বর্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের যে সকল পণ্ডিত ভারতীয় সমাজ-জীবনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লক্ষণগুলি দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন, অর্থাৎ ভালই হোক আর মন্দই হোক প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনধারা অনুরূপ লক্ষণযুক্ত, তাঁদের মধ্যে জার্মাণ চিন্তানায়ক স্পেংলার (Spengler) ও হার্টমুট পাইপার (Hartmut Piper) ও হারম্যান গেট্‌জ (Hermann Goetz), জার্মাণ পণ্ডিত জে. জে. মায়ার (J. J. Meyer), আমেরিকান সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন (Sorokin) উল্লেখযোগ্য।

এই পুস্তকের জুড়িদার গ্রন্থ এযুগে আর কোনো বাঙালী তথা ভারতবাসীর হাতে দ্বিতীয় বাহির হয় নি। যে ব্যাপক ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থে বিনয়কুমার দিয়েছেন, তা অতি-বড় পণ্ডিতকেও বিস্মিত করে। মতবাদের দিক দিয়ে নয়, কেবল পাণ্ডিত্যের দিক থেকে পাশ্চাত্যের কোনো কোনো পত্রিকা তাঁকে "দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট"-প্রণেতা জার্মাণ পণ্ডিত ওসওয়াল্ড স্পেংলারের ( Oswald Spengler-এর ) সমশ্রেণীভুক্ত করেছে। দেশী নজির দিয়ে বলা যায়, পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে বিনয়কুমার ছিলেন ব্রজেন-শীল-ধারার উত্তর-সাধক। আমরা বিদেশী পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য নিয়ে মুগ্ধ হয়ে আলোচনা করি, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ব্রজেন শীল ও বিনয় সরকার এই দুইজন মহামনীষী একালে যে অনন্য-সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেলেন, সে দিকে আমাদের সশ্রদ্ধ খেয়াল কৈ? এদেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্তমান লেখককে বিনয় সরকার প্রসংগে বলেন যে, "তাঁর তেমন কোনো দান নেই"; কিন্তু এত সহজে এত বড় প্রতিভাবান পুরুষের সাধনা ও সৃষ্টিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হয় না। "বাঙালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি" হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই পুরাণো উক্তি আজও একেবারে মিথ্যা নয়।

পাণ্ডিত্যের কথা বাদ দিলেও একমাত্র মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" বইখানা বিশেষভাবে সমাদৃত হবার দাবী রাখে। আধুনিক কালে রাজা রামমোহন রায়ই বোধ হয় তুলনামূলক আলোচনায় ভারতের প্রথম গুরু। সে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তাবীরদের প্রায় সকলেই কমবেশী তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর প্রয়োগ করে এসেছেন। এই সনাতন আলোচনা-প্রণালীতে ভারতকে ফেলা হতো বিলাত বা বড় জোর বিলাত-আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে। বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গী বললে তখন



সাধারণত অ্যাংলো-আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতে বুঝা হতো। এই "বিলাতী" চোখ দিয়ে বিশ্বপর্যালোচনার সংকীর্ণ সীমানা থেকে ভারতীয় পাণ্ডিত্যকে মুক্ত করবার জন্য বিনয় সরকার "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থে দস্তুরমাফিক লড়াই করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত তুলনা-মূলক আলোচনা-প্রণালীতে বিদেশ বললে শুধু বিলাত বা বিলাত-আমেরিকা বুঝায় না। তাঁর আলোচনায় ভারত এসে হাজির হয় বিশ্ব-সভ্যতার বারোয়ারীতলায়। তাঁর ঐতিহাসিক আলোচনায় ভারত এসে দাঁড়ায় চীনা সভ্যতা, জাপানী সভ্যতা, রুশীয় সভ্যতা, বল্কান সভ্যতা, জার্মাণ সভ্যতা, ফরাসী সভ্যতা, ইতালিয়ান সভ্যতা ও বিলাত-আমেরিকার সভ্যতার পাশাপাশি। এই বিশ্ব-সংস্কৃতির গতিশীল পটভূমিতে ভারতীয় সভ্যতার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা বিনয় সরকারের এক প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক কীর্তি* (১৭)।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বিনয় সরকার যে বিশ্লেষণ-প্রণালী কায়েম করেন, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব। তাঁর পূর্বে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতেরা প্রায়ই তুলনামূলক আলোচনায় যুক্তিনিষ্ঠ মেজাজের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁদের তুলনামূলক আলোচনায় প্রধানত তিন প্রকারের গলদ থেকে যেতো। প্রথমত, ঐ সকল তুলনামূলক আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে "সমশ্রেণীর তথ্য" ( সেম্ ক্লাস্ অব ফ্যাক্টস্ ) গৃহীত ও ব্যবহৃত হতো না। পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রায়ই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক গড়নের সংগে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত-সংস্কৃতির তুলনা করতে

---

* (১৭) বর্তমান লেখক প্রণীত "ঐতিহাসিক বিনয় সরকার" প্রবন্ধটি ( "বঙ্গশ্রী", মাঘ, ১৩৫৯ ) দ্রষ্টব্য।

অভ্যস্ত ছিলেন। পাশ্চাত্যের যুক্তিনিষ্ঠ মনীষিদের চিন্তাধারার পাশে ভারতীয়-জনসাধারণের নানা কুসংস্কারপূর্ণ জীবনধারাকে বিশ্লেষণ করে প্রাচ্যের দৈন্য ও হীনতাকে বড় আকারে দেখানো হতো। পক্ষান্তরে ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রচারকেরা ভারতীয় আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা সপ্রমাণ করবার আকাঙ্ক্ষায় পশ্চিমা আধ্যাত্মিক সাধনার ধারাকে অনেক সময়ই সজ্ঞানে-অজ্ঞানে বয়কট্ করে চলতেন। দ্বিতীয়ত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তথ্য-ব্যাখ্যায় "একই ধরণের বিশ্লেষণ-প্রণালী" (সেম্ ইন্ট্রুমেণ্ট অব ইনটারপ্রিটেশান্) প্রয়োগ করা হতো না। তৃতীয়ত, দফায়-দফায় (আইটেম্ বাই আইটেম্) অর্থাৎ আদর্শ ও চিন্তার সংগে আদর্শ ও চিন্তার এবং কর্মপ্রচেষ্টা ও বাস্তব প্রতিষ্ঠানের সংগে কর্ম-প্রচেষ্টা ও বাস্তব প্রতিষ্ঠানের তুলনাসাধন করা হতো না। প্রাচ্যের আদর্শকে তুলনায় ফেলা হতো পাশ্চাত্যের বাস্তব প্রতিষ্ঠানের পাশে, আবার পশ্চিমা আদর্শকে তুলনা করা হতো প্রাচ্য প্রতিষ্ঠানের সংগে। যুগের পর যুগ ধরে দফায় দফায় বিজ্ঞাননিষ্ঠ মেজাজে তুলনায় আলোচনা চালানো হয় না বলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সভ্যতার স্বরূপ নিয়ে অনেক অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদ ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নামে দেশে-বিদেশে প্রচারিত হয়েছিল এবং আজও হয়ে থাকে। ১৯৪৩ সনে প্রকাশিত ক্ষিতিমোহন সেনের "ভারতের সংস্কৃতি" ও ১৯৪৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ব্রজসুন্দর রায়ের "ভারতীয় সভ্যতা" গ্রন্থে এই ভুল ব্যাখ্যার সাম্প্রতিক নজির মেলে।

উল্লিখিত এই তিনপ্রকার গলদ থেকে তুলনামূলক আলোচনাকে মুক্ত করবার জন্য বিনয় সরকার তাঁর "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থে সজাগভাবে লড়াই করেছেন পশ্চিমা পণ্ডিতদের আসরে। বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক আলোচনার ফলে যে সত্য তাঁর দৃষ্টিকে বার বার আকর্ষণ করেছে, তা হলো সভ্যতার আদর্শ ও



সংস্কৃতি বিকাশের ধারায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভেতর মূল পার্থক্য টানতে যাওয়া নেহাৎ গা-জুরী। প্রাচ্যের সভ্যতায় তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম-সাধনা বা অতীন্দ্রিয়ামির বিশেষ কোনো বাণী বা বৈশিষ্ট্য নেই, আবার পাশ্চাত্য সভ্যতায়ও তথাকথিত জড়নিষ্ঠা, ভোগবাদ বা সংসারধর্মের বিশেষ কোন দর্শন বা স্বাতন্ত্র্য নেই। প্রাচ্য পশ্চিম থেকে বেশী নীতিনিষ্ঠ, বেশী আধ্যাত্মিক, বেশী ধর্মপ্রবণ নয়, আবার পশ্চিমও প্রাচ্য থেকে বেশী সংসারনিষ্ঠ, বেশী ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ, বেশী ভোগবাদী নয়। আমরা সাধারণতঃ প্রাচ্য ইতিহাসের সংসারনিষ্ঠার ধারাগুলির যথেষ্ট খেয়াল রাখি না বলে এবং পশ্চিমা ইতিহাসের ধর্ম-সাধনার ঐতিহ্য যথেষ্ট ভাবে জানি না বলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-বিষয়ক ভুল মতবাদ যখন-তখন ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে চালিয়ে থাকি। এই অভিযোগ বিনয় সরকার তুলেছেন দেশী-বিদেশী "ইণ্ডোলজিষ্ট"দের বিরুদ্ধে। "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া"র লেখক পশ্চিমা চিন্তামহলে এক তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। জার্মাণ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়ক "গেয়ো-পোলিটিক" (ভূ-রাষ্ট্র) বিদ্যার জন্মদাতা ডক্টর কার্ল হাউসহোফার এই বই সম্বন্ধে পত্রিকায় লিখেছিলেন: "এশিয়ান দৃষ্টিভংগী থেকে রচিত যত বই আমি পড়েছি, তাদের মধ্যে এ বইখানি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।" মার্কিণ দার্শনিক জন ডুয়ী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্ণার, সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন প্রমুখ মনীষিগণও এই বইকে অত্যন্ত উঁচুদরের বলে সমাদর করেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রিক নেতাদের ভেতর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, স্বর্গীয় ভি. জে. প্যাটেল্ ও সুভাষচন্দ্র বসু এক সময় এই গ্রন্থ সাগ্রহে পড়েছিলেন।

## "হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শন"

১৯২২ সনে প্রকাশিত বিনয় সরকারের আর একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম "দি পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশানস্ অ্যাণ্ড থিয়োরীজ অব

দি হিন্দুজ" (লাইপৎসিগ, ১৯২২)। হিন্দু-জাতির রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শন-বিষয়ক গবেষণার এক প্রকাণ্ড দলিল তাঁর এই বইখানি। প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও বৈদেশিক ভারত-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই বইখানি মূলত প্রতিষ্ঠিত। তৃতীয় ধরণের দলিল অর্থাৎ বিদেশী ভারত-বৃত্তান্তের নজির তোলা হয়েছে বটে, কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সংগে। মেগাস্থনিস্, য়ুয়ান-চুয়াঙ্ ইত্যাদির রিপোর্টগুলা কতখানি বস্তুনিষ্ঠ, সে প্রশ্ন প্রতিপদে জিজ্ঞাসা করতে করতে লেখককে অগ্রসর হতে হয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের মালমশলা মোটের উপর গ্রন্থকার বর্জন করেছেন। এমন কি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'কেও যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ বাস্তব অবস্থার প্রতিচ্ছবি "অর্থ-শাস্ত্রে" কতখানি, সে-সন্দেহ গ্রন্থকারের মনে সর্বদা জাগরূক। বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় আলোচিত ভারততত্ত্ব-বিষয়ক রচনাগুলিও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যসমৃদ্ধির কথা বললেই বিনয় সরকার সম্বন্ধে বলা শেষ হয় না। তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভংগী ও মৌলিক বিশ্লেষণ-প্রণালী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন হিন্দুজাতির রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রিক তত্ত্ব যুগের পর যুগ ধরে তিনি আলোচনা করেছেন পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শনের পাশা-পাশি। আচার্য যদুনাথ সরকার ঐ গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা প্রসংগে "মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকায় (জানুয়ারী, ১৯২৩) যে মন্তব্য করেছিলেন, তা আজকের দিনেও ভারতীয় ইতিহাস-গবেষকদের পক্ষে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের দেশের লোকেরা প্রায়ই বিস্মৃত হয় যে কেবল মূল উৎসের সাহায্যে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে পারলেই কোন মানুষের পক্ষে আমাদের অতীত সম্বন্ধে সুদক্ষ ঐতিহাসিক হওয়া যায় না। যে পর্যন্ত না বিদেশী ইতিহাস, বিশেষতঃ ইয়োরোপের ইতিহাস অধ্যয়ন করে সে এক প্রসারিত দৃষ্টিভংগী অর্জন করেছে এবং ভারতীয়



ইতিহাসের তথ্যগুলি তুলনায় আলোচনা ও সমালোচনা করতে অধিকারী হয়েছে, সে পর্যন্ত সেই ঐতিহাসিক গবেষকের মানসিক প্রস্তুতি ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। সকলের আগে প্রয়োজন রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানার্জন। কারণ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানই ইতিহাসের সারবস্তু, আর এ বিদ্যার উপর দখল থাকলেই ইতিহাসের যথার্থ বিশ্লেষণ সম্ভব।" বিনয় সরকারের বইয়ের নজির তুলে আচার্য যদুনাথ সরকার নিজের ঐ অভিমতের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। তিনি লেখেন: "প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান-বিষয়ক ব্যাপক ও সঠিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর (বিনয় সরকারের) চেয়ে কোনো যোগ্যতর লোকের কথা কল্পনা করা কঠিন। তাঁর স্বাধীন ও মৌলিক দৃষ্টিভংগী সবচেয়ে বেশী উল্লেখ-যোগ্য" * (১৮)। তৎকালে জার্মাণ ঐতিহাসিক অধ্যাপক যোলি

* (১৮) "It is difficult to conceive of a man more fully qualified than he (Mr. B. K. Sarkar) is to treat of ancient Indian political institutions comprehensively and correctly. He knows Sanskrit and has translated and critically commented one of the ancient works on polity, the *Shukra-niti*. He has deeply and widely studied European history, politics and economics, and what is of priceless value, he has lived among the greatest and most progressive European thinkers on Economics and Politics and some of the makers of modern European history. Benoy Kumar's account of the political institutions of the ancient Hindus is correct and full and enriched by frequent comparisons with those of ancient Greece and modern Europe and America. But even more valuable is his fresh and independent outlook. In fact a fully scientific and philosophical treatment of the subject has been here attempted by a man equipped with modern political knowledge and the modern outlook. The book, therefore, marks a distinct and long step in our knowledge of ancient India in its *true* bearings on human thought" (Observations of Sir Jadu Nath Sarkar in course of a lengthy review published in the *Modern Review* for January, 1923, pp. 50-52).

(Jolly) জার্মাণ পত্রিকায় ঐ বই সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ ভাষায় সুখ্যাতি করেছিলেন ও বিনয়কুমার সরকারকে "a scholar of universal equipment" বলে সম্বর্ধনা করেন (১৯২৩)। অধ্যাপক র‍্যাপসন্, মাস্‌সন্-উর্সেল, হিল্লেব্রাণ্ট ও মায়ারও এই গ্রন্থের বিশেষ তারিফ করেছিলেন। তৎকালে এই ধরণের বই বেশী ছিল না; প্রকৃতপক্ষে বিনয় সরকারই প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শন সম্বন্ধে বড় গোছের প্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন ও সেই হিসাবে তিনি পথ-প্রদর্শকের ইজ্জদ্ পেতে বাধ্য। তাঁর বই বের হয় ১৯২২ সনে। এর পর বৎসর প্রকাশিত হয় ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের "এ হিস্ট্রি অব হিন্দু পোলিটিক্যাল থিয়োরীজ" (১৯২৩), ১৯২৪ সনে বাহির হয় ডক্টর কে. পি. জয়শোয়ালের "হিন্দু পলিটি" ও ১৯২৭ সনে বাহির হয় ডক্টর বেণীপ্রসাদের "থিয়োরী অব গবর্ণমেণ্ট ইন এ্যানশেণ্ট ইণ্ডিয়া"। তৎপর আরও অনেক গ্রন্থ এবিষয়ের উপর প্রকাশিত হয়েছে। হালে ভারতীয় ইতিহাস সমিতির পক্ষ থেকে "ভারতীয় জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি" সম্বন্ধে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-দর্শনের যে আলোচনা সন্নিবেশিত আছে, তার তুলনায় ১৯২২ সনে প্রকাশিত বিনয়কুমারের অনুরূপ আলোচনা আজও সেকেলে মনে হয় না। অবশ্য সন-তারিখের কথা স্বতন্ত্র।

বিনয় সরকারের শেষ বয়সের লেখা আর একখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম "ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া" (১৯৩৭, পৃঃ ৭২৫)। মোহেন্‌জোদারো সভ্যতার যুগ থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সময় পর্যন্ত গতিশীল ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির পরিমাণ ও মূল্য জরিপ করা হয়েছে এই বইখানিতে। বইখানি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানেও



ভারত এসে হাজির হয়েছে বিশ্বসভ্যতার পাশে যুগের পর যুগ ধরে। এখানেও আবার সেই তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর প্রয়োগ হয়েছে সজ্ঞানভাবে ও ব্যাপকভাবে। এই বইখানি সম্বন্ধে জনৈক ফরাসী অধ্যাপক সমালোচনাকালে লিখেছিলেন: "বিনয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় স্বার্থের খাতিরে এবং সত্যনিষ্ঠার খাতিরে উভয়বিধ কারণেই মূল্যবান। তিনি যে শুধু আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে নতুন নতুন তথ্যেরই সন্ধান দিয়েছেন তা নয়, যাদের আমরা জানি বলে ধরে নিয়েছিলাম, তাদেরও আগাগোড়া নতুন নতুন মূর্তিতে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। এখন থেকে আমরা মানব-সংস্কৃতির বিষয়ে মূল্য নিরূপণের মানও পাল্‌টিয়ে ফেলতে বাধ্য হবো।" এই বইয়ের সমালোচনা প্রসংগেই জার্মাণ-চিন্তাবীর কার্ল হাউসোফার (Karl Haushofer) তাঁর "গেয়োপলিটিক" (Geopolitik) পত্রিকায় লিখেছিলেন যে "ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া" ও "ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থদ্বয় জননায়কগণের ডজন ডজন বক্তৃতা ও শত শত পুস্তিকা থেকেও বিশ্বের দরবারে ভারতের সপক্ষে বেশী কাজ করেছে—"Two such works carry a great people further onwards in the culture-political front of the world than dozens of agitation-speeches and hundreds of brochures by demagogues."

মনে পড়ছে, রমেশ দত্তের "ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" (বৃটিশ ভারতের আর্থিক ইতিহাস) গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতের এক জননায়ক স্বদেশী যুগে বলেছিলেন,—"ডজন ডজন কংগ্রেস-বক্তৃতার চেয়ে রমেশ দত্তের অর্থ নৈতিক বইগুলা বেশী কাজের।" এ ধরণের অভিমতগুলা যুক্তিনিষ্ঠার মানদণ্ডে হয়ত সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায় না। এ-সব খানিকটা এক-চোখো। কেননা সমালোচকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনকে

অনর্থক হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন; কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকে অগ্রাহ্য করবার প্রয়োজন নেই। তথাপি ঐ ধরণের অভিমতের দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে সূচিত হয় যে, জাতীয় উন্নতির জন্য এই বইগুলা যারপরনাই কার্যকরী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে গ্রন্থগুলা যে অমূল্য তার কোন সন্দেহ নেই।

## বাংলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চা—অনুবাদ-সাহিত্য

বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চার ফলাফল শুধু বিদেশী ভাষাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। স্বজাতির কাছে উচ্চতম গবেষণার ফলাফল মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করাও ছিল তাঁর এক সজ্ঞান সাধনা। স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১১) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজন ও গুরুত্ব জননায়কগণের দৃষ্টিতে বিশেষ উঁচু ঠাঁই দখল করে। "জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন" তৎকালে আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নি নিশ্চয়, কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্যগুলি একেবারে ব্যর্থও হয় নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তার সবটুকু কৃতিত্ব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর আরোপ করলে ইতিহাসের বিচারে তা খণ্ডিত হবে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের চিন্তা ও কর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকখানি। বাংলা ভাষায় উচ্চ গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থাবলী রচনার কাজে যে সকল যুবা গবেষক তৎকালীন ব্রতী হন, তাঁদের ভেতর বিনয়কুমার নিঃসন্দেহে একজন; আর তাঁদের মুষ্টিমেয় যে কয়জন কৃতবিদ্য তরুণ একটা মহৎ উদ্দেশ্য বা "মিশন" নিয়ে বংগ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন, বিনয়কুমার তাঁদের পুরোভাগে।

নবেম্বর, ১৯১১ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদককে বিনয়



সরকার এক পত্রে জানান: "বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচনা ও বিজ্ঞান, এই চারি শ্রেণীর সাহিত্য-সম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপযোগী করিয়া তোলা যে অবশ্য কর্তব্য, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই অনুমোদন করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সংকলন ও অনুবাদ করা আবশ্যক এবং বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন-পূর্বক উপযুক্ত বৃত্তি দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই ধারণায় বিগত মাঘ মাসে উত্তর-বংগ সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে 'সাহিত্য-সেবী' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে, বহু সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-পরিপোষক এ বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া গত বৈশাখমাসে ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করি ও বহুল প্রচারোদ্দেশে উহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। ঐ প্রস্তাব নিম্নরূপ:—'বংগভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমুন্নত ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে বিবিধশাস্ত্রের গ্রন্থরচনা, সংকলন ও অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক"* (১৯)।

এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য বিনয় সরকার ১৯১১ সনেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করে তুলে দেন। ঐ অর্থে সৃষ্ট ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্-বর্ষোপলক্ষে করি-

* (১৯) রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক অনূদিত "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" (১৯২৬) গ্রন্থের প্রারম্ভে বিনয়কুমারের উক্ত পত্র সন্নিবিষ্ট আছে। এই প্রসংগে বিনয় কুমারের "বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থের ভূমিকাও (পৃঃ ৸৶০) দ্রষ্টব্য।

গুরুর নামের সংগে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের দর্শন, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থের সরল বংগানুবাদের কাজে ঐ অর্থ ব্যয়িত হবে,—এই ছিল বিনয়কুমারের সুস্পষ্ট নির্দেশ। স্বর্গীয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ লিখেছেন : "তাঁহার (বিনয়কুমারের) নির্বাচিত প্রথম গ্রন্থ ছিল গিজো-প্রণীত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস"। সেই নির্দেশানুসারে সাহিত্য-পরিষদ্ কর্তৃক আহূত হয়ে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ উক্ত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন ও ঐ তহবিলের অর্থ থেকে পরিষদ্ কর্তৃক ১৯২৬ সনে অনুবাদ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ঐ ফাণ্ডের অর্থ থেকেই ১৯৫৪ সনে রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ "অর্থনীতি ও করতত্ত্ব" নামে পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন বিনয় সরকার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অবৃত্তিক গবেষক সুধাকান্ত দে। তিনি প্লেটোর সমগ্র "রিপাব্‌লিক" গ্রন্থখানিও বাংলায় তর্জমা করেছেন। এখনও উহা পুস্তকাকারে বের হয় নি।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিনয় সরকার সাহিত্য-পরিষদের হস্তে অর্থ সমর্পণ করেই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেন নি। তিনি নিজেও অনুবাদের কাজে সক্রিয়ভাবে প্রবৃত্ত হন। ১৯১৪ সনে তাঁর হাতে বের হয় "নিগ্রোজাতির কর্মবীর।" ঐ গ্রন্থ নিগ্রোজাতির অধিনায়ক বুকার টি. ওয়াশিংটনের "আপ ফ্রম্ শ্লেভারী" (নিউইয়র্ক, ১৯০১) নামক আত্ম-জীবনীর বংগানুবাদ। অনুবাদের গুণে বইখানি এতই সরস ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে, অনুবাদ বলেই মনে হয় না। এককালে ঐ গ্রন্থ বাংলার যুবসম্প্রদায় সাগ্রহে পড়েছিল * (২০)।

* (২০) "Many of the older generation still feel grateful to Professor Sarkar for this exquisite translation of an inspiring book. It will be idle to deny that this publication had its place in the making of Bengal as it was in pre-Gandhian days." (Vide editorial comments of the *Calcutta Review*, January, 1950, p. 68).



বর্তমানে যাঁরা পঞ্চাশের কোঠে বা ষাটের কোঠে পা দিয়েছেন, তাঁদের অনেকের মুখেই এইরূপ স্বীকারোক্তি পেয়েছি।

বিনয় সরকার জার্মাণ ও ফরাসী ভাষা থেকেও কয়েকখানি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন—যেমন, "নবীন রাশিয়ার জীবন-প্রভাত" (ট্রট্স্কির জার্মাণ গ্রন্থের তথ্য), "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (এঙ্গেলস্-এর জার্মাণ গ্রন্থের তথ্য), "ধনদৌলতের রূপান্তর" (লাফার্গের ফরাসী গ্রন্থের তথ্য), এবং "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি" (ফ্রেডারিক লিষ্টের জার্মাণ গ্রন্থের তথ্য)। এই অনুবাদ গ্রন্থগুলি যথাক্রমে ১৯২৪, ১৯২৬, ১৯২৮ ও ১৯৩২ সনে প্রকাশিত হয়। এই সকল বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করে বিনয়কুমার বাংলা সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধ করেন নি, বাঙালী পাঠকের পাতে পাতে বিশ্বশক্তির নানা তথ্য ও চিন্তা পরিবেষণ করেছিলেন। "আর একটা কথাও এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে—সাম্প্রতিক কালের যে সব চিন্তা লইয়া, মতবাদ লইয়া দেশে আজ এত মাতামাতি চলিতেছে, তাহার অনেকটুকুই আমাদের ভাষায় প্রথম আমদানী করেন বিনয় সরকার।...অন্য বহু বিষয়ের মতো এবিষয়েও তিনি দেশের অগ্রগামী ভাবুক ও নায়ক স্বরূপ।" * (২১) বাংলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা তাঁর কাছে শুধু একটা জ্ঞান-চর্চার বিষয় ছিল না, এর পেছনে স্বদেশসেবার তাগিদও ছিল প্রচণ্ড। জাতীয় অভাব মোচনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর জ্ঞানচর্চাকে উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত করে রেখেছিল। দেশোন্নতির জন্য বাঙালীর বিদেশ-দক্ষ হওয়া প্রয়োজন, আর সেই দক্ষতার জন্য প্রয়োজন বিদেশী ভাষার উপর অধিকার অর্জন,—এই কথা তিনি বার বার দেশবাসীকে শুনিয়েছেন। বর্তমান পৃথিবীকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধির জন্য কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষার উপর

* (২১) বিনয় সরকার সম্বন্ধে "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনা (২৬শে নবেম্বর, ১৯৪৯) দ্রষ্টব্য।

নির্ভর করা অনুচিত ও অবাঞ্ছিত। তাই ইংরেজী গ্রন্থের তর্জমার উপর বেশী জোর না দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন মূল ফরাসী ও জার্মাণ ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের দিকে। ইতালিয়ান, রাশিয়ান ইত্যাদি বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদের কাজও তিনি সাগ্রহে তারিফ্ করতেন। রুশিয়ার কমিউনিষ্টদলের ইতিহাসের ইংরেজী গ্রন্থ বাংলায় তর্জমা করেন অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৪ সনে ঐ তর্জমা-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্র বিনয় সরকার মন্তব্য করেন: "বড়-বহরের তর্জমায়ও বাঙালী জাত বেশ-কিছু দেখাতে পারে নি। এই জন্যই তর্জমা সত্ত্বেও হীরেনের বাহাদুরি সম্বর্ধনা কর্‌ছি। চরম আগ্রহ দেখ্‌ছি, চরম উন্মাদনা দেখ্‌ছি, চরম আদর্শনিষ্ঠা দেখ্‌ছি, চরম ভক্তিযোগ দেখ্‌ছি, চরম বাংলাপ্রীতি দেখ্‌ছি, চরম স্বদেশ-সেবা দেখ্‌ছি। তর্জমায়ও তারিফ করবার মাল আছে। তর্জমাকারী হিসাবে, বড়-বহরের লেখক হিসাবে হীরেন যুবক বাঙলার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর রাষ্ট্রিক মতামত আমি জানি না। তার খবর না রেখেও আমি হীরেনকে নয়া-বাঙলার অন্যতম জবরদস্ত গঠন-কর্তা বল্‌তে প্রস্তুত আছি"* (২২)। প্রকৃতপক্ষে জাতির যে কোনো অভাব মোচনের জন্য যে কোনো শুভ প্রচেষ্টাই বিনয়কুমারের কাছে সম্বর্ধনার বস্তু ছিল। "অধ্যাপক সরকার বাঙালীর কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন এই জন্য যে, যে দিনে একজন বাঙালী অপর বাঙালীর কোন সাফল্যে ঈর্ষাকাতর, যখন একজন উপরে উঠিতেছে দেখিলে আর সকলে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে টানিয়া নামাইতে চাহে—তখন দেখিতে পাই—অধ্যাপক সরকার বাঙালী মাত্রের যে-কোন সাফল্যেরই জয়ধ্বনি করিতেছেন। শিল্প-বাণিজ্য, কল-কারখানা, কোন কিছু আবিষ্কারে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি—যে কোন ক্ষেত্রে যে

* (২২) বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ১৯৪৫, পৃঃ ২৮২।



বাঙালী যতটুকুই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে—অতুলনীয় দরদ লইয়া তিনি তাহা আর দশজনকে দেখাইতেছেন। সর্বতোভাবে বাঙলার এমন দরদী বান্ধব বস্তুতই বিরল"* (২৩)।

## "বর্তমান জগৎ"-বিষয়ক গবেষণা

বাংলা সাহিত্যে বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার সবচেয়ে বড় দান তের খণ্ডে সমাপ্ত 'বর্তমান জগৎ' (১৯১৪-৩৫, পৃঃ ৪৭২৮)। ঐ বিশাল গ্রন্থ তাঁর বিশ্ব-পর্যটনের ফল। উহা একদিকে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আর এক দিকে বর্তমানকালীন পৃথিবীর নানা জাতি ও সংস্কৃতির পর্যালোচনা। আধুনিক পৃথিবীর গতি ও প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় ঐ গ্রন্থ যেন এক বিশ্বকোষ। বিভিন্ন সমাজ ও জাতির রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার-নীতি, শিক্ষা-সংগীত-সুকুমার শিল্প, আন্তর্জাতিক লেন দেন ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিব্যক্তির আলোচনা ও সমালোচনা ঐ গ্রন্থের ভিতরকার কথা। বইয়ের পাতা উল্টালেই দেখা যায় যে, গ্রন্থকার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখবার নামে বর্তমান জগৎ-বিষয়ক গবেষণার মালমশলা সংগ্রহ করে চলেছেন অতি সজাগভাবে ও ধারাবাহিকভাবে। চীনা, জাপানী, ইংরেজী, মার্কিন, ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান প্রভৃতি বহুসংখ্যক দলিল থেকে ঐ গ্রন্থের তথ্য ও ঘটনাবলী সংগৃহীত হয়েছে। তার উপর আছে লেখকের নিজস্ব বিশ্লেষণ ও মন্তব্য; কিন্তু ঘটনাস্রোতের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণই এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়। এর অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির প্রায় সবটুকুই ১৯১৪-২৫এর ভেতর "গৃহস্থ", "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "ভারতী", "নব্য-ভারত", "উপাসনা", "শঙ্খ", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", "সারথী", "শিশির", "বিজলী" ইত্যাদি

* (২৩) বিনয় সরকার সম্বন্ধে "আনন্দ বাজার পত্রিকা"র সম্পাদকীয় মন্তব্য (২৬শে নবেম্বর, ১৯৪৯) দ্রষ্টব্য।

মাসিকে ও সাপ্তাহিকে প্রথম প্রকাশিত হয় ও পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে বাহির হয় ( ১৯১৪-৩৫ )। গোপাল হালদার মহাশয় ১৯৪৫ সনে বর্তমান লেখককে বলেন,—"আজকাল অনেক বিষয়ে বিনয়বাবুর সংগে আমাদের মত মেলে না ; কিন্তু তৎকালে ( ১৯১৪-২৫ ) আমরা তাঁকে Indian intellectual life-এর ideal বলে মনে করতাম। তাঁর বিদেশ ভ্রমণের বৃত্তান্ত সে সময় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হতো। প্রতি মাসে অধীর আগ্রহে দিন গুণতাম কবে 'প্রবাসী'র নতুন সংখ্যা বের হবে।" ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন মহাশয়ও বলেন : "তৎকালে আমরা অনেকেই বিনয়বাবুর লেখা বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সংগে পড়তাম ও তাঁকে বিবেকানন্দের উত্তরসাধক বলে মনে করতাম।" "বর্তমান জগৎ"-বিষয়ক বিনয়কুমারের তৎকালীন রচনাবলী যুবা সমাজের উপর যে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার আর এক সমসাময়িক সাক্ষ্য পাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নলিনী পণ্ডিতের উক্তিতে * (২৪)। "বর্তমান জগৎ" রচনার পেছনে দেশাত্মবোধের প্রেরণা কি পরিমাণে সক্রিয় ছিল, তার পরিচয় পাই বিনয়কুমারের নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে : "বিদেশে আমি যা করেছি তা বোধ হয় কোনো বাঙালীকে না জানিয়ে করিনি। আমি এক সংগে ৩।৪।৫।৭ হাজার বাঙালীকে আমার সংগে সংগে টেনে নিয়ে গিয়েছি। লেখালেখির মারফৎ গোটা বাঙালী জাতিটাকে, চেষ্টা করেছি দুনিয়া টহল করাতে।···নিজে গিয়ে বিদেশ দেখে একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে ; কিন্তু বাঙালী জাতের চাকর আমি। আমার পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব। এক সংগে পাঁচ সাত

* (২৪) Vide : *The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar* edited by Prof. Banesvar Dass, 2nd Edition, Calcutta, 1940, pp. 527-538.



হাজার বাঙালীকে গোটা দুনিয়া দেখিয়ে এনেছি। বাঙালী জাত এক সংগে বর্তমান জগৎ দেখেছে" * ( ২৫ )।

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে "বর্তমান জগৎ" এক যুগ-নির্দেশক গ্রন্থ। এই বিশাল গ্রন্থে বর্তমান দুনিয়ার ভাঙা-গড়া ও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারাগুলি যে-ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা লেখকের অসামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক। এত তথ্যসমৃদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ বর্তমান জগৎ বিষয়ক আলোচনা বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও নেই। প্রাচীন-নিষ্ঠ, ভারত-নিষ্ঠ, "শুক্রনীতি"র তর্জমাকারী বিনয়কুমার এই গ্রন্থে পুরাপুরি বর্তমাননিষ্ঠ ও দুনিয়ানিষ্ঠ। আমাদের দেশে যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস-চর্চা করেন, তাঁরা প্রায়ই ইয়োরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ; আর যাঁরা ইয়োরোপের ইতিহাস জানেন, তাঁরা আবার ভারতের ঐতিহাসিক ধারার প্রতি সজাগ বড় কম। বিনয় সরকার এই রীতির এক প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম স্বরূপ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে, এক হাতে ভারত-বর্ষের জ্ঞান আহরণ করে আর এক হাতে ইয়োরোপের জ্ঞান সংগ্রহ করে যে তুলনামূলক ঐতিহাসিক আলোচনা যুগের পর যুগ ধরে দফায় দফায় চালিয়েছেন, তার সমকক্ষতা অর্জন করতে আজও বেশী বাঙালী বা ভারতবাসী পেরেছেন বলে মনে হয় না। ইয়োরামেরিকার

* (২৫) "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন", ১ম ভাগ, ১৯৩২, পৃঃ ৪৩০-৪৩২ দ্রষ্টব্য। বিনয় সরকারের এই উক্তি যে কতদূর সত্য, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তির মধ্যে। "বর্তমান জগৎ" প্রসংগে "ক্যালকাটা রিভিয়ু" সম্পাদকীয় মন্তব্যে ( জানুয়ারী, ১৯৫০ ) বলেন যে : "They were read with avidity by young students of schools and colleges. The first World War had already broken the insularity of outlook of the Indian youth. A new interest in the world outside was created. This was now further stimulated by Prof. Sarkar's diaries published in a series of volumes entitled *Contemporary World*."

পণ্ডিতদের মধ্যেই বা কয়জন গবেষক এই দুঃসাহসিক কাজে এ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন, সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। এই অনুসন্ধানের স্পৃহা যতদিন আমাদের মধ্যে যথার্থভাবে জাগ্রত না হবে, ততদিন আমাদের পক্ষে বিনয় সরকারের মত ব্যক্তির বিশ্বজোড়া জ্ঞান-চর্চার সঠিক মূল্য নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব।

## বিনয়কুমারের চিন্তায় "পাশ্চাত্য" গবেষণার ঠাঁই

আর একটা কথা। আমাদের দেশে আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় যে ইতিহাস-গবেষণা চালানো হয়, তাতে প্রধানত বা একমাত্র ঠাঁই পায় প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগীয় ভারত, অষ্টাদশ বা বড় জোর ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত। বিংশ শতাব্দীর বাংলা বা ভারত-বিষয়ক গবেষণা এখনও বহু পণ্ডিত বরদাস্ত করতে পারেন না। আর এইখানেই লক্ষ্য করি বিনয় সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণার এক মস্তবড় স্বাতন্ত্র্য। তাছাড়া, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন স্তর ও যুগ নিয়ে স্বাধীন গবেষণায় এখনো আমরা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি। ১৯৫০ সন পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ইয়োরোপীয় ইতিহাস-সংক্রান্ত বইয়ের সংখ্যা মাত্র তিনখানা—দুইখানা ইংরেজীতে আর একখানি বাংলায়। ইংরেজী বই দুখানার মধ্যে আবার একখানির লেখক বিদেশী গ্রন্থকার ডক্টর সি. কে. ওবেষ্টার। বাংলা বইখানির নাম "মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ" (১৯৩৯)। লেখক অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার। এই সামান্য তথ্যটুকু থেকেই সূচিত হয়, ইয়োরোপীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক গবেষণায় আমাদের দেশ কত পশ্চাৎপদ। পাশ্চাত্যবাসীরা "ভারততত্ত্ব" ও "এশিয়াতত্ত্ব"-বিষয়ক বিদ্যায় যে ধরণের গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাতে অভ্যস্ত, ঠিক তদনুরূপ যোগ্যতা বাঙালী ও ভারতবাসীকে অর্জন করতে হবে



"ইয়োরোপতত্ত্ব" ও "পাশ্চাত্যতত্ত্ব"-বিষয়ক গবেষণায় ও অনুসন্ধানে। বিনয় সরকারের নিজের ভাষায় তবে বলি: "ইয়োরোপের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে কেতাব মুখস্থ করিয়াছেন আমাদের অনেকেই। একথা অজানা নাই কাহারও; কিন্তু চাই 'স্বাধীন'ভাবে 'ভারতীয় স্বার্থে' ইয়োরামেরিকার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ক্ষমতা। পশ্চিমারা যেমন 'ভারততত্ত্ব', 'প্রাচ্যতত্ত্ব' ইত্যাদি বিদ্যা কায়েম করিয়া নিজেদের জ্ঞান-মণ্ডল বাড়াইয়া তুলিতেছে, ভারত-সন্তান সেইরূপ ইয়োরামেরিকা-তত্ত্ব বা পাশ্চাত্যতত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে কি? সেই ক্ষমতা সৃষ্টি করিবার জন্য ভারতে ব্যবস্থা কোথায়? এই অজ্ঞতা যতদিন থাকিবে, ততদিন ভারতবাসী ইয়োরোপের সংগে ভারতবর্ষের (রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে) তুলনা করিতে ভয় পাইবে। 'বাপরে! গ্রীস?' 'বাপরে! রোম?' এইরূপ থাকিবে ততদিন ভারতীয় পণ্ডিতদের চিন্তা প্রণালীর ঢঙ্! আর ততদিন ভারতবাসী ভারতীয় সভ্যতাকে 'আধ্যাত্মিক' হিসাবে ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা হইতে উচ্চতর ভাবিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া গোঁফে চাড়া মারিতে লজ্জা বোধ করিবে না।" এই কথা বিনয়কুমার লেখেন "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" গ্রন্থের ভূমিকায় ১৯২৪ সনে। আবার তারও দুই বৎসর পূর্বে "দি ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া" (১৯২২) গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন: "In historical fields the brain of India is as barren as in the philosophical. The world has a right to demand that Indian scholars should be competent enough to attack the problems of Latin-American, Russian, Italian or Japanese history with as great enthusiasm as Western students employ in the study of Oriental lore.

Indians must get used to discussing Europe and America with as much confidence as Europeans and Americans in lecturing and writing on Asia. Not until such an all-grasping world-view, a bold man-to-man individualistic understanding of things, a self-conscious attitude in regard to the events of the human world, a humanistic approach to the problems of race-development is ingrained in the mentality can one expect to see a real historical school grow up in Young India's intellectual *milieu*" ( p. 328 ). অর্থাৎ দর্শনের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ইতিহাস বিভাগেও বর্তমান কালের ভারতবর্ষ নিতান্তই দরিদ্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সাহস ও আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে প্রাচ্য সভ্যতার নানা বিভাগে গবেষণা করতে অভ্যস্ত, ভারতবাসীকেও সেইরূপ সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হতে হবে লাতিন-আমেরিকা, রাশিয়া, ইতালিয়ান বা জাপানী ইতিহাস পর্যালোচনায়। এইজন্য সকলের আগে চাই এক আত্ম-চৈতন্যশীল নতুন বিশ্বদৃষ্টি বা জীবনদৃষ্টি। ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্বশাস্ত্রী ডক্টর ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত মহাশয় এক লিপিতে বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন: "এই বিষয়ে ( পাশ্চাত্যদেশ সম্বন্ধে গবেষণা ) কার্য করিতে হলে নিজেদের দেশের কথা আগে জানা উচিত। 'ইয়োরোপতত্ত্ব' লিখিবার আগে লেখককে 'ভারততত্ত্ব' জানা দরকার। সেই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা এবং inferiority complex আছে। দু-এক বৎসর ইউরোপে থাকিলে বা ইয়োরোপীয় পুস্তক পড়িলে ইয়োরোপতাত্ত্বিক হওয়া যায় না। এই বিষয়ে ভারতীয়দের গভীর বাধা আছে। শেষ কথা, ভারতীয়েরা ইংরেজীর মাধ্যমে বিদেশ ও স্বদেশকে দেখেন। সে রোগ আগে



সারুক।" যে রোগের কথা ডক্টর দত্ত মহাশয় এখানে উল্লেখ করেছেন, তাঁর চিকিৎসার বিধান হিসাবে অধ্যাপক বিনয় সরকার বার বার বিশেষভাবে বলেছেন, নিজেকে ভাল করে জানো, বিদেশকে ভাল করে জানো, তুলনায় সমালোচনা করো। "Nobody knows India who knows India only"—ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিনয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর এই উক্তির ভেতর সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট।

বাঙালী তথা ভারতবাসীকে বিদেশ-দক্ষ করবার জন্য বিনয়কুমার সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি বহুবারই বলেছেন যে, ইয়োরোপের সংগে ভারতের মান ও মর্যাদা সমান সমান ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার অন্যতম বিরাট কর্মপন্থা হলো বিদেশকে ভাল করে জানা, বিদেশ-দক্ষ হওয়া, বিদেশ সম্বন্ধে উচ্চতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া ও "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" করা। "শ' দুই-দেড়েক বৎসর ধরিয়া 'বর্তমান জগৎ' ভারতাত্মাকে খুব জোরসে ঘায়ের পর ঘা লাগাইতেছে। তবুও 'বর্তমান জগৎ'কে পাকড়াও করিবার আন্তরিক আর যথোচিত প্রয়াস ভারতীয় নরনারী করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে ভারত-সন্তান বড়ই উদাসীন।···বিশ্বশক্তিকে শক্তমুঠায় পাকড়াও করিবার উপর ভারতের আত্মিক, আর্থিক আর রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পূরাপুরি নির্ভর করিতেছে। কাজেই 'বর্তমান জগৎ' সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা সাহিত্য-সংসারের বিলাস-সামগ্রী মাত্র নয়"* (২৬)। বিদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানার্জন ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ জরুরী দেশোন্নতির মন্ত্র হিসাবে। বাংলায় বিশ্বশক্তিকে ও বর্তমান জগৎকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিনয়কুমারের যে সজ্ঞান সাধনা তা বিস্ময়কর। "বিশ্বশক্তির চর্চা" করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তিনি

* (২৬) বিনয় সরকার প্রণীত "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" ( প্রথম ভাগ, ১৯৩২, পৃঃ ৩৯৫-৯৬ )।

১৯১২-১৪ সন থেকে অহর্নিশ বলে এসেছেন। বিদেশ-পর্যটনের পূর্বেও তিনি একথা বলেছেন, আর বিদেশ পর্যটনের সময় ( ১৯১৪-২৫ ) আরও জোরের সংগে বলেছেন নানা সূত্রে, নানা ভাষায়। বারো বৎসর বিদেশ পর্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি আবার সেই পুরাতন অথচ নতুন মন্ত্র দেশবাসীকে শোনান। ১৯২৭ সনে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বাংলার যৌবনশক্তিকে "বিদেশ-চর্চা"র কথা বলেন ও তদুদ্দেশে "আন্তর্জাতিক ভারত সমিতি" কায়েম করবার জন্য আহ্বান করেন। কূপমণ্ডুকতা বর্জন করে খোলা চোখে দুনিয়াখানাকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা, বিশ্বপর্যটনে বাহির হওয়া, বিশ্বশক্তির আরাধনা করা জাতিগঠনের অন্যতম প্রধান আত্মিক ভিত্তি বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে পাশ্চাত্য দেশের সমসাময়িক চিন্তাধারা ও কর্মস্রোতের আভাষ দেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাঙন-গড়ন, পাশ্চাত্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে "পল্টনের সাজগোজ", "ফৌজের শিল্পশিক্ষা ও সমরশিক্ষা", "রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নয়া নয়া সমঝৌতা", "তুর্কী-গ্রীস গণ্ডগোল", "বলকান সমস্যা", "ইংরেজ-ফরাসীর রাষ্ট্রিক স্বার্থ", "রুশ-জাপানী ও রুশ-চীন সন্ধিচুক্তি", "ইংরেজ-আমেরিকার রাষ্ট্রিক সম্পর্ক", "অষ্ট্রিয়ায় 'বৃহত্তর জার্মানী'র আন্দোলন", "ভূমধ্যসাগরের রাষ্ট্রনীতি", "ল্যাটিন আমেরিকার আর্থিক ও রাষ্ট্রিক রূপ"* (২৭) ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা

* (২৭) "আমেরিকা-মহাদেশের যে-যে অঞ্চলে ল্যাটিন-সন্তান স্পেনিশ ও পর্তুগীজ ভাষার চল আছে, সেই অঞ্চলকে 'ল্যাটিন' বলা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডা ছাড়া আমেরিকার অন্যান্য অংশ সবই ল্যাটিন,—যথা মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, চিলি ইত্যাদি। একমাত্র ব্রেজিল হইতেছে পর্তুগীজভাষী। অন্যত্র চলে স্পেনিশ। ল্যাটিন আমেরিকার নরনারী মার্কিণ মাপে অর্থাৎ ইয়োরামেরিকার উচ্চতম সভ্যতার মাপকাঠিতে নেহাৎ নীচু। ইয়োরোপের বল্কান জনপদ, রুশিয়া ইত্যাদির অবস্থা যা,



করেন। বিনয়কুমার বলেন,—"ইয়োরামেরিকান অর্থাৎ পাশ্চাত্য নরনারীর জীবনযাত্রা ও সভ্যতাকে যুবক বাঙলার মুঠার ভিতর রাখিয়া কাজে নামিতে হইবে। ইহাই হইল আগাগোড়া আমার সমাজ-দর্শন। ইহাই আমার বিচারে দেশোন্নতি আর আর্থিক উন্নতির রাষ্ট্রনীতি; কিন্তু পাশ্চাত্য বলিলে কোনো একটা দেশ বা ঐক্যগ্রথিত সামঞ্জস্যশীল জনসমাজ বুঝিতে হইবে না। ইয়োরামেরিকার দেশগুলার ভিতর বামুন শূদ্দুর ফারাক আছে বিস্তর। এই ফারাকগুলা ভারতবর্ষে একপ্রকার আলোচিতই হয় না।...নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তনে যাঁহারা মোতায়েন হইতেছেন, তাঁহাদের মগজ হইতে এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কারটা ঝাড়িয়া ফেলা সর্বাগ্রে আবশ্যক।

"ইংল্যাণ্ড, জার্মাণি, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তিন দেশ বর্তমান জগতের সেরা। এই তিন দেশেরই জুড়িদার—বহরে ছোট থাকা সত্ত্বেও—অষ্ট্রিয়া, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, বেলজিয়াম আর হল্যাণ্ড। এই গোত্রের ভিতরই ফ্রান্সকেও ফেলিতে পারি; কিন্তু যন্ত্রনিষ্ঠা, শিল্পদক্ষতা ইত্যাদি একালের ধনদৌলত-বিষয়ক মাপকাঠিতে ফ্রান্স খানিকটা খাটো। জিজ্ঞাস্য,—ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলার অবস্থা কিরূপ? আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলার ভিতর আধুনিকতা, বর্তমান-জগৎসুলভ কর্ম-প্রবণতা, একেলে সভ্যতা কতখানি প্রবেশ করিয়াছে? পূর্বোক্ত তালিকা হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথা বাদ দিলে যে কয়টা দেশ থাকে, তাহারা সমগ্র ইয়োরোপের কতটুকু অংশ? বস্তুতঃ এক-তৃতীয় অংশের বেশী নয়। অর্থাৎ ইয়োরোপের দুই-তৃতীয় অংশ বর্তমান জগতের মাপকাঠিতে বেশ কিছু অবনত। এমন কি ইতালিও যারপরনাই খাটো।

মেক্সিকো, ব্রেজিল, চিলি ইত্যাদি জনপদের আর্থিক অবস্থাও তাই। এক কথায় ভারতের নরনারীরা ল্যাটিন আমেরিকার নরনারীকে মাসতুত ভাইবোন বিবেচনা করিলে ভুল হইবে না।"—বিনয় সরকার প্রণীত "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন", ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮-১৯।

অথচ ইতালি রাষ্ট্রিক বিচারে প্রথম শ্রেণীর শক্তি। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, শিল্পনিষ্ঠা, সভ্যতা ইত্যাদির বিচারে প্রথম শ্রেণীর দেশ না হইয়াও ইতালি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারিয়াছে। রুশিয়ার দৃষ্টান্ত সেই কথাই বলিতেছে। এই সকল বিষয়ে রুশিয়া ইতালির চেয়েও অবনত * (২৮)।

"তাহা ছাড়া বল্কান জনপদের দিকে তাকাইলে বেশ বুঝিতে পারি যে, ইয়োরামেরিকান বা পাশ্চাত্য সভ্যতা ইত্যাদি নামে কোন ঐক্যশীল ধরণ-ধারণ নাই। কোথায় লণ্ডন, বার্লিন, প্যারিস্ আর কোথায় সোফিয়া, বুখারেষ্ট, বেলগ্রেড ইত্যাদি···ইয়োরামেরিকার এই ভেদগুলা সম্বন্ধে সজাগ না থাকিলে আমরা পদে পদে অতিমাত্রায় নৈরাশ্য আর কর্মপঙ্গুত্ব দেখিতে থাকিব মাত্র" * (২৯)।

## ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক অনৈক্য

আবার ১৯৩১ সনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতাকালে বিনয় সরকার ইয়োরোপীয় ইতিহাসের বহুল-প্রচারিত ভুল মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন ও বাংলার যৌবন-শক্তিকে "বিশ্বশক্তির বেপারী" হতে বলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইয়োরোপ বাস্তবক্ষেত্রে ঐক্যসাধনের রাষ্ট্রযোগে এশিয়ার নরনারী অপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। "মধ্যযুগের তথাকথিত ইয়োরোপীয় ঐক্য আর তথাকথিত ভারতীয় ঐক্য কথার কথা মাত্র ছিল। তাহাতে হয়ত বা

* (২৮) রুশিয়া সম্বন্ধে একথা ১৯২৭ সনে বিনয়কুমার বলেন। ১৯২৮ সন থেকে ক্রমিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারা প্রবর্তন করে রুশিয়া যেভাবে আধুনিক শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়ে আসছে, সে কথা বিনয়কুমার তাঁর "The Equations of World-Economy" গ্রন্থে (১৯৪৩) ও অন্যান্য পুস্তকে বিশ্লেষণ করেছেন।

* (২৯) নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৬-২৮।



সামাজিক লেনদেনে, ধর্মের আচার বিচারে, বিশেষত বড় ঘরের কৌলিন্যপ্রথায় একটা ঐক্য বা সাম্য অতি দূর দূর দেশের ভিতরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঐক্য, নরনারীর রাষ্ট্রগত একতা ইত্যাদি বলিতে বর্তমান যুগে যে ধরণের জনগণ-নিয়ন্ত্রিত স্বরাজের কথা উঠে, সে সব চীজ মধ্যযুগের ইয়োরোপে অথবা ভারতীয় বাদশা-তন্ত্রে দেখা যাইত না। সেই সব ঐক্য ছিল রাষ্ট্রীয় গোলামির আর রাষ্ট্রীয় যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। যাহা হউক ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে এই সেকেলে ঐক্যের মায়ামৃগ আর কাহাকেও প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই।" এই ক্ষেত্রে বিনয়কুমারের বক্তব্য ছিল যে ইয়োরোপীয় ঐক্য বস্তুটা অনেকটা কল্পনা মাত্র—ঐক্যহীন, বহুত্বশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ ইয়োরোপই ঐতিহাসিক বা বাস্তব সত্য। ভারতীয় বৈচিত্র্য ও অনৈক্য ঐ ধরণেরই বস্তু। একে দুর্বলতা মনে করা ভুল। ত্রিশ কোটি বা পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীকে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করার আকাঙ্ক্ষা বা দর্শন বর্তমান যুগোপযোগী নয়—উহা মধ্যযুগীয় স্বপ্ন মাত্র। আধুনিক কালের রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি ঐক্যবদ্ধ জীবন নয়, স্বরাজ বা স্বাধীনতাই আসল বস্তু। "Not unity, but independence is the distinctive feature of a national existence. The nation may thus represent one race or many. It may speak one language or it may be polyglot. It may be a uni-cultural or a multicultural organism. To an artificial corporation brought into being by the fiat of human creativeness, homogeneity of racial or linguistic interests is not necessarily a source of strength, nor is heterogeneity a special weakness" * (৩০) অর্থাৎ ভাষাগত

* (৩০) See B. K. Sarkar's *Politics of Boundaries* (Cal. 1926,

বা কৃষ্টিগত ঐক্যটাই রাষ্ট্রের শক্তি সূচিত করে না, আর ঐসকল ধরণের অনৈক্যও রাষ্ট্র-জীবনের দুর্বলতার পরিচায়ক নয়। নেপোলিয়ানের পরবর্তী যুগে ইয়োরোপীয়ানরা এ সত্য সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি ক'রে স্বাধীন স্বাধীন বহু রাষ্ট্র ইয়োরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে সৃষ্টি করবার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। "কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা আহাম্মুকের মত সেই মধ্যযুগের বুলি আর মধ্যযুগের কাজটা একালেও বেমালুম চালাইয়া যাইতেছি। তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের আলেয়ার পেছনে না ছুটিয়া··· ভারতকে ঐক্যগ্রথিত করিবার কথা না ভাবিয়া তাহাকে ছোট ছোট শক্তিশালী কতকগুলো স্বাধীন দেশে পরিণত করিবার" দিকে দৃষ্টি দেওয়াই স্বদেশসেবকের কর্তব্য।

রুশিয়াকে বাদ দিলে ইয়োরোপের ভৌগোলিক চৌহদ্দী যা দাঁড়ায় তার "প্রায় বার আনা" হলো আমাদের ভারত। ইয়োরোপের তিন-চতুর্থাংশ নরনারীকে একটা ঐক্যগ্রথিত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রসংঘে বা সংযুক্ত ইয়োরোপে গড়ে তোলার চেষ্টা যতটা "বুদ্ধিহীনতার পরিচয়", গোটা ভারতবর্ষের নরনারীকে একত্র করে একটা ঐক্যগ্রথিত রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনাও ততটাই "আহাম্মুকির পরিচয়"। ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে ছোট ছোট জনপদে যে ধরণের স্বাধীন ও স্বরাজশীল রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেই ধরণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং আত্মকর্তৃত্ব লাভই ভারতবাসীর পক্ষে বাঞ্ছনীয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল মতামত বিনয় সরকার প্রকাশ করেন ভারতের প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে,—১৯২৫-৩০ সনের ভিতর বা তারও পূর্বে। তখনকার হিসাবে বোম্বাই প্রদেশ আয়তনে ছিল ইতালি বা নরওয়ের সমান, আসাম প্রদেশ গ্রীসের চেয়ে

pp. 21-22) in which the author rejects the romantic soul-theory of nationality as propagated by Herder and Mazzini and advocates the positive theory of nation-making.



কিছু বড় ও চেকোশ্লাভাকিয়ার চেয়ে কিছু ছোট, মাদ্রাজ প্রদেশ পোল্যাণ্ডের সমান, আর বাংলাদেশ চেকোশ্লাভাকিয়া ও লিথুনিয়া এই দুই ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের সমান সমান। বর্তমান ইয়োরোপে ছোট-বড়-মাঝারি বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র বর্তমান। এই সকল রাষ্ট্রের অনেক-গুলিরই "আয়তন" ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের সমান বা তারও ছোট। আবার "লোকসংখ্যা"র দিক থেকে বিষয়টা তুলনা করা যাক। কতগুলি লোক থাকলে এক একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে? এই বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বিনয়কুমার বলেন যে, বুলগারিয়ার লোকসংখ্যা নিয়ে আসামে, স্পেনের লোকসংখ্যা নিয়ে পঞ্জাবে, গ্রেট বৃটেনের লোকসংখ্যা নিয়ে মাদ্রাজে, গ্রেটবৃটেন বা জার্মাণীর লোকসংখ্যা নিয়ে যুক্তপ্রদেশে ও বাংলায় এক একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। "ইয়োরোপ-সুলভ অনৈক্যই" রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে বিনয়কুমার ভারতে চেয়েছেন ও বলেছেন যে "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তনের কাজে সর্বপ্রথম জরুরি কাজ এই নবীন বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রদর্শন।"

## 'নেশ্যন'-রাষ্ট্রের স্বরূপ

বিনয় সরকারের আরও একটা বক্তব্য এই প্রসংগে বলা দরকার। "ইয়োরোপের এই যে ত্রিশ বত্রিশটি ছোট ছোট স্বাধীন দেশ, তাদের প্রত্যেকটার ভিতরে কোনো প্রকার ঐক্য আছে কি? অনেকক্ষেত্রেই বিলকুল না। অথচ আমরা ভারতে আহাম্মুকের মতন বুলি আওড়াইয়া থাকি যে, ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি বাস্তবিক এক একটা ঐক্য-গ্রথিত দেশ। ইংরেজীতে একটা শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেটা ঐক্য-গ্রথিত অথবা একতাশীল লোকসমষ্টির প্রতিশব্দ বিশেষ। তাহাকে বলে "নেশ্যন"। আমাদের রাষ্ট্রিক মহলে, সাংবাদিক মহলে, দার্শনিক

মহলে, সাহিত্যিক মহলে, পণ্ডিত মহলে, সর্বত্রই একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, ইয়োরোপের ছোট ছোট স্বাধীন দেশগুলি বাস্তবিকই এক একটা 'নেশ্যন' অর্থাৎ জীবনের সকল প্রকার কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি ঐক্যবিশিষ্ট সমষ্টি। আসল কথা অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় একদম উল্টা" * (৩১)। বর্তমান ইয়োরোপীয় ইতিহাসের কয়েকটা "তথা-কথিত নেশ্যন-রাষ্ট্র" বিশ্লেষণ করে এবার দেখা যাক। প্রথমেই ফ্রান্সের কথা ধরা যাক। "ফ্রান্স এমন একটা দেশ যেখানে অনেক বিষয়ে কতকগুলি ঐক্য আছে। ফ্রান্সকে অনেক বিষয়ে আমরা ঐক্যবিশিষ্ট লোক-সমষ্টির সুবিস্তৃত জনপদ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। করিলে বেশী ভুল হইবে না। কিন্তু তবুও বাস্তবিক পক্ষে, ফ্রান্সের 'জাতিগত' ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই বলা উচিত। আছে 'জাতিগত' বৈচিত্র্য। এখানকার লোকসংখ্যা ৪০,৭৫০,০০০। এই কিঞ্চিদূর্ধ চার কোটি নরনারীর ভিতর ১,৭০০,০০০ জার্মাণ, ১,০০০,০০০ কেল্ট, ৬০০,০০০ ইতালিয়ান, ২৫০,০০০ স্পেনিস। তাহা ছাড়া অন্যান্য কুচোকাচা প্রায় ৬০০,০০০। অধিকন্তু ফ্রান্সে যাহারা আসল 'ফরাসী', তাহাদের ভিতরও অসংখ্য 'জাতি', 'উপজাতি' রহিয়াছে।"

এবার একটা ক্ষুদ্রাকার দেশ, বেলজিয়ামের কথা ধরা যাক। "এখানে চল্লিশ লক্ষ ফ্লেমিশ নরনারীর সংগে ঘর করে ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার হ্বালুনজাতীয় নরনারী। তাহার উপর আছে লাখ খানেক জার্মাণ, অধিকন্তু লাখ চারেক অন্যান্য জাতীয় লোকও বেলজিয়ামে বাস করে। অর্থাৎ ফ্লেমিশ জাতীয় লোক এখানে অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশী।"

এবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক মানচিত্রের দিকে তাকানো যাক। ভার্সাই সন্ধির রচয়িতারা পুরাতন অষ্ট্রিয়ান বা অষ্ট্রো-

* (৩১) নব্য বাঙ্গলার গোড়া পত্তন, ২য় ভাগ, ১৯৩২, পৃঃ ৩৫৩-৩৭১ দ্রষ্টব্য।



হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলে তার ভেতর থেকে নতুন নতুন "নেশ্যন"-রাষ্ট্র খাড়া করেছেন বলে প্রচার করতে কসুর করেন নি। ভার্সাই সন্ধিচুক্তির মধ্য দিয়ে যে সকল তথাকথিত "নেশ্যন"-রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে আছে পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগশ্লাভিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র। একটু গভীরভাবে এই সকল নবসৃষ্ট নেশ্যন-রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যায় যে, ঐ সকল রাষ্ট্রের প্রত্যেকটাই এক-একটা ক্ষুদ্রকায় পুরাণো অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী জাতীয় রাষ্ট্র ("an old Austria-Hungary in miniature")। পোল্যাণ্ড নামক নেশ্যন-রাষ্ট্রে "খাঁটি পোলিশ হাড়মাসের লোক শতকরা মাত্র ৫২·৭; অর্থাৎ প্রায় আধাআধি লোকই এই দেশের 'খাঁটি স্বদেশী' নয়। এদেশের লোক-সংখ্যা ২৭,০০০,০০০। ইহার ভিতর শতকরা একুশ জন লোক উক্রেন রক্তের লোক, শতকরা এগার জন ইহুদীর বাচ্চা, শতকরা ৭·৩ জার্মাণ, শতকরা সাত জন জার্মাণ। তাহা ছাড়া অন্যান্য মোৎফারাক্কা জাতি শতকরা এক জন ধরিতে হইবে।" আবার চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের রূপ বিশ্লেষণ করলেও ঐ একই চিত্র দেখা যায়। ঐ দেশের নামের সংগেই দুই দুইটা জাতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—একটার নাম চেক, সংখ্যায় শতকরা ৪৪·৪; আর একটা জাতির নাম শ্লোভাক, সংখ্যায় শতকরা মাত্র ১৪·৮। অবশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ২৭·৪ হলো জার্মাণ, শতকরা ছয় জন ম্যাজিয়ার, ইত্যাদি। বিনয়কুমার বলেন, তথাকথিত ইয়োরোপীয়ান 'নেশ্যন'-রাষ্ট্রের "প্রায় প্রত্যেকটার ভিতরেই দেখিতে পাই, একাধিক ভাষার প্রভাব অথবা আধিপত্য। আবার প্রত্যেকটিতে দেখিতে পাই, একাধিক 'জাতি'র প্রভাব অথবা আধিপত্য। 'জাতি' অনুসারে রাষ্ট্র ইয়োরোপের প্রায় কোথাও নাই। ভাষা হিসাবে রাষ্ট্রও ইয়োরোপের একপ্রকার কোথাও নাই। প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বহু ভাষার জয়জয়াকার। আবার প্রত্যেক রাষ্ট্রে বহু

জাতিরও জয়জয়াকার। ইহাই হইল ইয়োরোপের রাষ্ট্রবিধানের গোড়ার কথা।" তথাকথিত জাতিগত বা ভাষাগত ঐক্য অনুসারে "পৃথিবীর কোনো মুল্লুকে রাষ্ট্র কায়েম করা অসম্ভব।" সেই সূত্র অনুসারে "বাংলা দেশে বাঙ্গালী জাতি যে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে, সেই রাষ্ট্রে কতকগুলি অ-বাঙ্গালী জাতি ও অ-বাঙ্গালী ভাষা থাকিবেই থাকিবে।" আবার অ-বাঙ্গালীর গড়া রাষ্ট্রেও কম-বেশী বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বা বাংলা-ভাষী থাকিবেই থাকিবে। এ সত্য "নিরেটভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে" উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা বিনয়কুমার বার বার বলেছেন। তিনি ইতিহাস পর্যালোচনা করে আবার বলেছেন যে রাষ্ট্র-গঠনের ব্যাপারে ধর্মীয় ঐক্য সন্ধান করাও আর একপ্রকারের বুজরুকি। ইয়োরোপের তথাকথিত "জাতি"-রাষ্ট্রের (Nation-State-এর) মূলেও ধর্মগত ঐক্য নাই। যুদ্ধোত্তর যুগের একমাত্র হাঙ্গেরী রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যায় যে, ছোট-ছোট রাষ্ট্রেও কিরূপ ধর্ম-বৈচিত্র্য বর্তমান। "ধর্মের ঐক্য স্বাধীনতার ভিত্তি নয়। ধর্মের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষ স্বাধীন জাতি, দেশ বা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। আর তাহাই ইতিহাসের চোখে স্বাভাবিক কথা" * (৩২)।

## "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন"

বিনয় সরকারের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাংলায় লেখা একখানি বড় গ্রন্থের নাম "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন"। ১৯২৪ সনে ইতালীতে অবস্থানকালে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন ও ঐ বৎসরের

* (৩২) বিনয় সরকারের "বাঙ্গালীজাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠা" প্রবন্ধটি (Acharyya Ray Commemoration Volume, Calcutta 1932, pp. 201-215) পঠিতব্য।



নবেম্বর মাসে প্রকাশের নিমিত্ত কলিকাতায় পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন। স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের আগ্রহে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয় ও ১৯২৬ সনে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদে"র তদ্বিরে মুদ্রিত হয়। ঐ বইয়ে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-শাসন আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের চারিটি অধ্যায়ের নাম "হিন্দু নর-নারীর শাসন-দক্ষতা", "হিন্দুরাষ্ট্রে স্বরাজ", "সাম্রাজ্য-শাসনে হিন্দুসমাজ" ও "গণতন্ত্রে হিন্দুরাষ্ট্র"। দফায় দফায় তুলনা চালানো হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রিক গড়নের সংগে। এই আবহাওয়ায় হিন্দুজাতি "শক্তি-যোগী এবং টক্কর-প্রিয়", "হিংসাধর্মী এবং বিজিগীষু"। প্রাচীনকালের হিন্দুজাতি রাষ্ট্রিক ময়দানে গ্রীক, রোমান ও খৃষ্টিয়ানদের সংগে "সমানে-সমানে পাঞ্জা কষিতে" সমর্থ ছিল। বইটার ভেতর এই শক্তিধর্মী ভারতের মূর্তি উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রাচীন 'লিপি'-সাহিত্য, মুদ্রা ও বিদেশী ভারত-বৃত্তান্ত এই তিন শ্রেণীর সাক্ষ্য বইয়ের ভেতর ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া, আধুনিককালে প্রাচীন ভারত-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও গ্রন্থ ১৯২৪ সন পর্যন্ত দেশে-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে, তারও ব্যবহার দেখতে পাই বইটার ভেতর। ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান পণ্ডিতদের ভারতবিষয়ক গবেষণার ফলাফল মূল রচনা থেকেই লেখক গ্রহণ করেছেন। তৎকালে প্রাচীন-ভারত-বিষয়ক উচ্চগবেষণার ফলাফল আমাদের দেশী পণ্ডিতেরা মূলত ইংরেজী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করতেন। আর. জি. ভাণ্ডারকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষকের রচনা ১৯২৪-২৬ সনেও বংগ-সাহিত্যে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। এই সকল ঐতিহাসিকের

গবেষণার ফলাফল তখনও বাঙ্গালী বাংলা ভাষার সাহায্যে বিশেষ জানতে পারে নি। এই দিক থেকে বিচার করলেও বিনয় সরকারের "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" ( ১৯২৬, পৃঃ ৩৮০ ) বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ অভাব মোচন করে। এই গ্রন্থে "'লিপি'-সাহিত্য অথবা অন্য কোনো প্রমাণ-ভাণ্ডার হইতে লম্বা লম্বা বিবরণ উদ্ধৃত করা হয় নাই", এবং এইভাবে পুস্তকখানিকে "বহরে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র করা হইয়াছে।" এই প্রসংগে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন ঃ "লম্বা লম্বা মৌলিক বৃত্তান্ত এবং তাহার দশগজি চওড়া তর্জমা প্রত্নতত্ত্বের গ্রন্থে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু জীবন-তত্ত্বের বেপারীর পক্ষে 'ভিতরকার কথাটা' টানিয়া বাহির করাই বিজ্ঞান-চর্চার একমাত্র লক্ষ্য। প্রত্নতত্ত্বের হাবিজাবি জবরজঙ্ ল্যবরেটরিতে বা কর্মশালায় রাখিয়া রংগমঞ্চে দেখাইতেছি কেবলমাত্র হিন্দুনরনারীর রাষ্ট্রীয় রক্ত-তরংগ"* (৩৩)।

## ঐতিহাসিক গবেষণায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

বিনয় সরকারের ইতিহাস-চর্চা সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলতেন যে আমাদের দেশে সাধারণত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকেই ইতিহাস-বিষয়ক গবেষণা বলে ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু এই দৃষ্টিভংগী নিতান্ত সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। আধা-জানা, সিকি-জানা সত্য প্রকাশ করা বা একদম না-জানা তথ্য উদ্ধার করা ঐতিহাসিক গবেষণার অন্যতম ধারা বটে, কিন্তু নতুন তথ্য উদ্ধার না করেও একজন গবেষক পুরাতন তথ্যগুলিকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের দ্বারা ঐতিহাসিক হতে পারেন। তাছাড়া, তথ্য বা বিশ্লেষণ পুরাতন থেকেও ঐতিহাসিক গবেষণায় নতুন নতুন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাও সম্ভব। অর্থাৎ বিনয় সরকারের মতে ঐতিহাসিক গবেষণার ত্রি-ধারা হচ্ছে—

* (৩৩) "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।



তথ্য বা "ফ্যাক্টস্"-সংক্রান্ত খোঁজ-খবর, বিশ্লেষণ-প্রণালী বা "মেথডলজি"-বিষয়ক অনুসন্ধান, আর সিদ্ধান্ত বা "মেসেজ"-বিষয়ক গবেষণা। ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রত্নতাত্ত্বিক দিকটাই একমাত্র বা সর্বাপেক্ষা বড় দিক নয়, অন্যান্য দিকও সমান দরের ও সমান মূল্যবান।

তাছাড়া, ইতিহাসের আলোচ্য বস্তু শুধু প্রাচীন অতীত নয়, বর্তমান ও সাম্প্রতিককালের ঘটনাস্রোতও ইতিহাসের বড় আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ে অনেক পণ্ডিতের সংগে বিনয় সরকারের মতবিরোধ ছিল। অতি প্রাচীন বা পুরাতন বিষয়ে অনুসন্ধানকেই তিনি ঐতিহাসিক গবেষণার পক্ষে মহত্তর বা মহত্তম বিবেচনা করতেন না। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান থাকলেই ঐতিহাসিকের পক্ষে নিঃসক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হয়, এও একরকম কুসংস্কার। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে অতীত অনেক সময়ই কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান না থাকলেই বর্তমানের ঘটনাস্রোত বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা যে অসম্ভব তাও সত্য নয়। যেমন নৈকট্যের বিপদ আছে, তেমনি দূরত্বেরও অসুবিধা বর্তমান। নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছিঁকেয় তুলে রেখে বিজ্ঞাননিষ্ঠ মেজাজে ঘটনা ও বস্তুর দিকে তাকাবার ক্ষমতার উপরই ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের শক্তির উপরই ইতিহাস-রচনার সফলতা বা সার্থকতা মূলত নির্ভরশীল। সমসাময়িক ইতিহাস-রচনায় থিউকিডিডিস্ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার উৎকর্ষ আজও বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন ও 'পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক' বলে তাঁকে মর্যাদাও দিয়ে থাকেন। উইন্‌ষ্টন চার্চিলের বিশ্বযুদ্ধ-বিষয়ক বিরাট ইতিহাস গ্রন্থমালা অতি-আধুনিক ও সাম্প্রতিককালের ইতিহাস রচনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিনয় সরকারও সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস রচনায় একাধিক গ্রন্থে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সার্থক ও সম্বর্ধনাযোগ্য।

ঐতিহাসিক গবেষণায় এই অভিনব দৃষ্টিভংগীর যাঁরা একালে বড় প্রতিনিধি, তাঁদের ভেতর একজন মার্কিণ চিন্তাবীর সোরোকিন, বৃটিশ চিন্তানায়ক টয়েন্‌বি, ভারতীয় চিন্তাগুরু বিনয় সরকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত, মতবাদ বা ব্যাখ্যার দিক থেকে এঁরা পরস্পর থেকে পৃথক্ এবং সেই পার্থক্য কি বা কতখানি আর তাঁদের মতামত কতখানিই বা শেষ পর্যন্ত স্বীকার্য সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

আর একটা কথা। বিনয় সরকার বলতেন যে, প্রাচীন পুঁথিপত্র, লিপি ইত্যাদি পড়ার ক্ষমতা ঐতিহাসিক গবেষকের পক্ষে নিঃসন্দেহে জরুরী। কিন্তু একমাত্র ঐসব বিদ্যা দখলে থাকার জোরে কোনো ব্যক্তি যথার্থ ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়ায় না। একটা জাতির জীবন-স্পন্দন বা রক্তস্রোত বুঝিবার জন্য প্রত্নতত্ত্বের মালমশলার উপরে চাই আরও রকমারি বিদ্যায় দখল। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যগুলাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করবার জন্য প্রতিমুহূর্তে আবশ্যক হয় আইনতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজস্ব-বিদ্যা, লড়াই-বিদ্যা, আন্তর্জাতিক লেন-দেন-তত্ত্ব ও এর সংগে আবার প্রয়োজন নৃতত্ত্ব ও চিত্তবিজ্ঞান। এই সকল বিদ্যা গবেষকের মুঠার মধ্যে না থাকলে তার পক্ষে যথার্থ ইতিহাস-রচনা অসম্ভব। কারণ প্রত্নতত্ত্বের বাস্তব মালমশলাগুলাকে ব্যাখ্যা করতে না পারলে সে বিদ্যা ইতিহাস হয় না। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ বা দর্শন ইতিহাসের ভিতরকার কথা। বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার বিবরণীকে বলে প্রত্নতত্ত্ব আর সেই প্রত্নতত্ত্বকে দার্শনিক ব্যাখ্যার সংগে সংযুক্ত করতে পারলে হয় ইতিহাস। কাজেই সত্যকার ইতিহাস কখনো পুরাপুরি বা সর্বাংশে বস্তুনিষ্ঠ বা অবজেকটিভ্ হতে পারে না। বিনয় সরকার প্রায়ই বৈঠকী মোলাকাতে বলতেন "Unbiased history is a contradiction in terms"* (৩৪)।

* (৩৪) "Even in regard to the problems of Indology it were good to admit frankly that although India is co-operating with the West in producing first class archaeology, of real history there is virtually nothing. History begins where archaeology ends. It is only when Indian scholarship proceeds to galvanize the dry bones of excavated data with the vital physiology of philosophical 'prejudices' (no matter of what sort) that compilers of *Cambridge Modern History* and their admirers in Europe and America will be moved to announce the historians of Asia as some of the first class intellectuals of the world and shake hands with them on a basis of equality. It must never be forgotten that history is a science altogether different from archaeology. In order to be lifted up to history archaeology must have to be impregnated with a bias, an interpretation, a standpoint, a philosophy, a 'criticism of life'" (*The Futurism of Young Asia*, Leipzig, 1922, pp. 328-329).



বিনয় সরকার ঐতিহাসিক-চর্চায় যে অভিনব ধারা সৃষ্টি করেন, তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ আজও হয় নি। তিনি নিজে গবেষণা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি; স্বকীয় আত্মপ্রত্যয় বহুজনের মধ্যে সঞ্চারিতও করেছিলেন। তিনি স্থাপন করেছিলেন "বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্" (১৯২৮), "বংগীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ্" (১৯৩৭) ইত্যাদি গবেষণা মন্দিরগুলি। ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার মাধ্যমে অনুসন্ধান চালানো এই সকল পরিষদের অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল। একালের বহুসংখ্যক যুবা গবেষক ঐ সকল পরিষদের আবহাওয়ায় প্রথম প্রেরণা লাভ করেছিলেন ও অনেকের লেখা বইও বিনয় সরকারের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়। অধুনা-প্রতিষ্ঠিত "বংগীয় বিজ্ঞান পরিষদ্" (১৯৪৮) ও "বংগীয় ইতিহাস পরিষদে"র (১৯৫০) অগ্রজ হিসাবে বিনয় সরকারের "বংগীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদ্" ও "বংগীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ্" ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

## ইতিহাস-চর্চায় "বস্তুনিষ্ঠা"র প্রয়োজনীয়তা

বিনয় সরকারের গবেষণা-রীতির প্রধান দুই খুঁটা হলো 'দুনিয়া-নিষ্ঠা' ও 'বস্তুনিষ্ঠা'। নিজের দেশকে ভাল করে জানতে গেলেও বিদেশটা ভাল করে জানা জরুরী, এই ছিল তাঁর এক প্রধান বাণী। আর দ্বিতীয় বাণী ছিল বস্তুনিষ্ঠ মেজাজে গবেষণা ও অনুসন্ধান। যথেষ্টভাবে তথ্য বা ফ্যাক্টস্ দখলে না রেখে আংশিক তথ্য ও প্রমাণের জোরে বহু পণ্ডিতই যখন তখন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ভুল মতবাদ বা দর্শন প্রচার করে থাকেন। তাঁরা অনেক সময়ই মস্তবড় পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও বস্তুনিষ্ঠার অভাব বশত তাঁদের সিদ্ধান্ত বা মতামতে তথ্যনিষ্ঠার দারিদ্র্য দেখা যায়। ভাব-প্রবণতা বা বদ্ধমূল ধারণার মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে বস্তুনিষ্ঠ (objective)-ভাবে জ্ঞান-চর্চার কথাই তিনি দেশবাসীকে বার বার বলেছেন। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে না তাকিয়ে, লাভ-লোকসানের খতিয়ান না করে, যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞান-নিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে জ্ঞান-চর্চার সাধনাই তাঁর জীবনের আসল বাণী। দেশকে ভালবাসতে গিয়ে যাঁরা বিদেশকে জাহান্নামে পাঠান, আর যাঁরা বিদেশকে বড় করতে গিয়ে দেশের সংস্কৃতি বা সভ্যতার প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিতে বিস্মৃত বা কুণ্ঠিত হন,—বিনয়কুমার ছিলেন উভয় দলেরই ঘোর বিরোধী।

তাই দেখি, কট্টর 'জাতীয়তাবাদী' হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর ঐতিহাসিক রচনাবলী কখনো 'জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে' বা 'প্রচার-সাহিত্যে' পর্যবসিত হয় নি। ইংরেজ শাসনে ভারতের অন্তর্বিহীন দুঃখ-দুর্দশার সংগে সংগে এর গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিও তিনি তাঁর রচনায় সমান উৎসাহে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত ধনবিজ্ঞান-চর্চা ছিল রাষ্ট্রনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত—তাঁর ইতিহাস-চর্চা ছিল সংখ্যাশাস্ত্র ও বস্তুনিষ্ঠার



নিরেট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ভারতের প্রাক-বৃটিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগেও তিনি রাষ্ট্রনেতাদের সংগে বা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের সংগে সুর মিলিয়ে কথা বলতে পারেন নি। তাঁর জনপ্রিয়তার পথে তাঁর নির্দয় সত্য ভাষণও অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর (১৯৪৭) তিনি জাতীয়তা-বাদী গবেষক ও লেখকদের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলেন :

"For quite a long time Indian intellectuals, publicists and patriots have been specializing in the drawing up of a somewhat rosy picture about the mediaeval periods of our history. The object has been subconsciously, as well as consciously and deliberately to throw the British regime into the shade in the perspective of free India of bygone days···Now that the British regime has formally gone out of the picture it is time for archaeologists, antiquarians and other research scholars about India to re-examine the archives and other objective evidences···It is desirable to emancipate ourselves from the attitudes and reactions produced by the situation of enmity to England's role in India" * (৩৫).

ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিনয়কুমারের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারে না। আচার্য যদুনাথ সরকার ১৯২৩ সনে মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে বিনয়কুমার সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

* (৩৫) Vide *Dominion India in World-Perspectives* (Cal., 1949), pp. 160-161.

"Our author is an ardent Indian nationalist, his life-history is a testimony to the fact,—but he is singularly free from national prejudices. Like the Hero-Prophet of Carlyle he insists on discarding all shows, all painted idols and laying bare the heart of things, and reaching the bed-rock of Fact. Such an honest physician, such a teacher inspired by love of truth, is needed by India to-day in the hour of her national awakening." বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্য উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণই ঐতিহাসিকের স্বধর্ম—তথ্যগুলির মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে শক্তি বা যুক্তি যোগানো তাঁর স্বাভাবিক ও সত্যকার ধর্ম নয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় বাস করেও ঘটনাবলী বিকৃত না করে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে ইতিহাস রচনা যাঁরা করতে পারেন-কালের বিচারে তাঁরাই উত্তীর্ণ হন। আচার্য যদুনাথ সম্বন্ধে এই কথা সকলের আগে প্রযোজ্য। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি"র প্রভাব থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মুক্ত হবার কথা বিশেষ জোরের সংগে ঘোষণা করেছেন। তাঁর "জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক" রচনায় ইতিহাস-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই আলোর সন্ধান পাবেন* (৩৬)।

দেশবাসীকে বিনয় সরকার বস্তুনিষ্ঠ হতে বলেছেন। ইতিহাস-চর্চায় বা জ্ঞানের সাধনায় বস্তুনিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠা হবে মানবজীবনের আত্মিক ভিত্তি। আজকাল বহু গবেষকের মধ্যে প্রায়ই একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; আর তা হলো নিজেদের মৌলিক গবেষণাকারী দার্শনিক বা ঐতিহাসিক বলে জাহির করবার প্রলোভনে

* (৩৬) "ইতিহাস" ত্রৈমাসিক, সপ্তম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৫৭ দ্রষ্টব্য।



পূর্বগামীদের দানের প্রতি সজ্ঞান উপেক্ষা। তাঁদের রচনা পড়ে পাঠকের সহজেই ধারণা হতে পারে যে, ঐ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরাই বুঝি যথার্থ পথপ্রদর্শকের কাজ করে চলেছেন; কিন্তু সামান্য খোঁজ সুরু করলেই প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা আন্দোলনের সমসাময়িক মনীষী ও কর্মীদের ভেতর একাধিক বা বহুসংখ্যক কৃতী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া, পাঁচ-দশ-বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বেও প্রায় এই ধরণের একাধিক মনীষী বা কর্মীর চিন্তা ও কর্ম স্পর্শ করা সম্ভব। তাই গবেষণার সময় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই পূর্ববর্তী ভাবুক, সাধক বা নায়কদের কাজকর্ম বিষয়ে সজাগভাবে খোঁজ চালিয়ে নিজ রচনায় তাঁদের দানের প্রতি স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন সর্বদার জন্যই বাঞ্ছনীয়। তাঁদের মতামত বা চিন্তা কতখানি স্বীকার্য সে প্রশ্ন না তুলেও তাঁরা শুধু পূর্বগামী ভাবুক হিসাবেই সম্বর্ধনাযোগ্য। উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যা পেয়েছি, তার প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি না থাকলে অতীতের সংগে বর্তমানের ব্যবধান বড় হয়, সত্যকে জানার পথে অন্তরায় এসে দেখা দেয়, পিতৃঋণ অস্বীকারের অপরাধে আমরা অপরাধী হই।

আর যেখানে আমরা পূর্ব-পুরুষের দান সজ্ঞানে অস্বীকার করি বা পূর্ববর্তী নায়ক ও ভাবুকদের বিষয়ে সচেতনভাবে উদাসীন থাকি, সেখানে আমাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে চরম অবিনয় ও লজ্জার কথা। পিতৃঋণ কারো পক্ষেই অস্বীকার করা চলে না। অথচ বহু গবেষক আছেন এ-দেশে ও বিদেশে যাঁরা এই অবিনয়ের দোষ থেকে মুক্ত নন। "পূর্বগামীদের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ" সম্বন্ধে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যা লিখেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "ঋণস্বীকারের বিনয় মনস্বিতারই ভূষণ। কোনো তথ্যের মূল উৎসের উল্লেখ বা অনুল্লেখে সাধারণ কর্তব্যতারই প্রশ্ন

আসে, বিনয়ের প্রশ্ন আসে না ; কিন্তু যাঁরা কোনো তথ্যের প্রথম সন্ধান দেন বা তার তাৎপর্যের প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যথাস্থানে তাঁদের নাম ও রচনার উল্লেখ না থাকলে বিনয়েরই প্রশ্ন আসে" (পূর্বাশা, শ্রাবণ, ১৩৫৮, পৃঃ ২৫৭-৫৮ দ্রষ্টব্য)। এদিক থেকে বিচার করলে "ঋণস্বীকারের বিনয়ে" বিনয় সরকার ছিলেন আদর্শস্থানীয়। তীব্র মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও পূর্বগামী ভাবুক ও নায়কদের প্রতি বিনয়কুমার প্রতি গ্রন্থে, এমনকি ছোট ছোট প্রবন্ধেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, কখনও পূর্বগামীদের নাম ও চিন্তা গ্রন্থের মূল বক্তব্যের সংগেই সংযুক্ত করে, কখনও বা পাদটীকায় তাঁদের নাম ও রচনার উল্লেখ করে। এ-ধরণের পাদটীকা তুলনায় কোন বিষয়কে জানবার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান, প্রায় অপরিহার্য। বিনয়কুমারের যে-কোনো গ্রন্থের পাতা উল্টালেই লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্বগামীদের প্রতি ঋণ স্বীকারের বিষয়ে তিনি কি পরিমাণ সজাগ ও হুঁসিয়ার। একমাত্র "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থখানি পড়লেই দেখা যায় যে, তিনি যে কার কাছে ঋণী আর কার কাছে অ-ঋণী এ বুঝাই মুস্কিল। অথচ এত লোকের কাছে ঋণ স্বীকার আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরেও তাঁর চিন্তাধারা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁর গবেষণা-রীতির এই বৈশিষ্ট্য তাঁর বস্তুনিষ্ঠা ও বহুত্বনিষ্ঠার সংগেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "দি ডেভেলাপমেণ্ট অব হিন্দু আইকোনোগ্রাফি" অর্থাৎ "হিন্দুজাতির মূর্তিতত্ত্বের অভিব্যক্তি" নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় (প্রথম সংস্করণ, ১৯৪১ সনে প্রকাশিত) বিনয় সরকার-বাঞ্ছিত এই গবেষণা-রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে। পূর্বগামীদের নামোল্লেখ করে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুধু বস্তু-নিষ্ঠারই পরিচয় দেন নি—ঐ বিদ্যার ক্রমোন্নতির ধারা বুঝবার পক্ষে



ভবিষ্য-যাত্রীদের পথও সুগম করে রেখে গেলেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এবিষয়ের প্রতি নতুন করে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বহুলোকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

পূর্বগামীদের দান স্বীকার না করলে নতুন গবেষকের পক্ষে হয়তো অবিনয় মাত্র ; কিন্তু এর থেকেও লজ্জাকর ও ভয়াবহ অবস্থা হলো অপরের দান বা সৃষ্টিকে সামান্য একটু পরিবর্তন করে মৌলিক গবেষণা বলে নিজের নামে চালাবার প্রচেষ্টা। এখানে কিন্তু এই চেষ্টাকে শুধু বিনয়ের অভাব বলবো না, একে সোজাসুজি intellectual dishonesty, অসাধুতা বা 'চুরি' বলাই সঙ্গত। গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের বৈঠকে মানুষের সবচেয়ে বড় অসম্মান এটাই। অবশ্য সম্মান বা অসম্মান বোধ মানুষে মানুষে আলাদা। একজনের বহু পরিশ্রম-লব্ধ জ্ঞান বা প্রয়াস-জনিত সাধনার ফল ভোগ করছে আর একজনে —জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম দৃষ্টান্ত অনেকেই লক্ষ্য করে থাকেন; আবার তাঁদের কেহ কেহ হয়তো ভুক্তভোগীও হয়েছেন। এই লক্ষণ বা দুর্বলতা শুধু এদেশের বৈশিষ্ট্য মনে করলে ভুল করা হবে—পাশ্চাত্যেও এই লক্ষণ সমভাবেই বর্তমান। বিনয়কুমার একবার বর্তমান লেখককে বলেন যে, ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসার অনেক দিন পর হঠাৎ একটা কাগজে দেখেন যে, তাঁর *Hindu Achievements in Exact Science* (নিউইয়র্ক, ১৯১৮, পৃঃ ১০০) গ্রন্থখানির অধ্যায়গুলি কোনো এক ইংরেজ পণ্ডিত সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকরূপে নিজের নামে ছেপে চলেছেন। বিনয়কুমারের প্রতি ঐ ইংরেজ পণ্ডিতের ভক্তিযোগের এ এক চরম দৃষ্টান্ত।

## বাংলার নবজাগরণে প্রাক্-রামমোহন যুগ

বিনয় সরকার তাঁর স্বদেশবাসীকে "বস্তুনিষ্ঠ" হতে উপদেশ দিয়েছেন। এই বস্তুনিষ্ঠার আর একটা বিশেষ দিকও আছে। তা হলো

গবেষণা চালাবার সময় নিজ মত ও পথ-বহির্ভূত অন্যান্য মত ও পথের সন্ধান রাখা, তার যথোচিত বিশ্লেষণ ও তুলনায় মূল্য-নিরূপণ করা। সাধারণত দেখা যায় লেখকেরা নিজ নিজ মত ও পথের বহির্ভূত তথ্যের বিশেষ খেয়াল রাখেন না, আর রাখলেও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, দলগত বুদ্ধি, সম্প্রদায়গত চেতনা বশত ঐ সব তথ্যের ও তত্ত্বের সন্ধান নিজ নিজ রচনায় প্রদান করেন না। কোনো জাতির বৈচিত্র্যশীল জীবনধারার অভিব্যক্তি বুঝবার পক্ষে এই ধরণের বই একান্তভাবেই অসম্পূর্ণ। বাংলার নবজাগরণ বা "রেণেসাঁস"-বিষয়ক যে সকল পুস্তক বা পুস্তিকা এযাবৎ বাজারে বের হয়েছে, তার অধিকাংশেই মূল গলদ হচ্ছে লেখকদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা। জাতির সর্বশ্রেণীর কাহিনী, বিভিন্ন মত ও পথের প্রতিনিধিদের আলোচনা এসব বইয়ে প্রায়ই নজরে পড়ে না। জাতির জীবনেতিহাস রচনার নামে এইসকল পুস্তকে লেখা হয়েছে দলগত কাহিনী আর উপাখ্যান অথবা বিশেষ বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস লেখকের পক্ষে ঐ যুগের মুসলমান ও খৃষ্টানদের জীবনকথা বাদ দেওয়া কোনো মতেই চলতে পারে না, যেমন পারে না ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখতে গিয়ে 'প্রখর ব্যক্তিত্বশালী' বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা বাদ দেওয়া। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বাঙালীর পক্ষে ভারতের নানা প্রান্তে বৃহত্তর বাংলা রচনা ও ভারতের রাষ্ট্রিক সীমানার বাহিরে সাংস্কৃতিক দিগ্‌বিজয়ের সাধনা। রামমোহনের সময় থেকে বা তারও পূর্ব থেকে বাঙালীর যে নবজাগরণ সেই জাগরণের পরিণতি দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাঙালীজাতির আত্মসচেতনভাবে দেশে-বিদেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এই ধারার দুই বিরাট প্রতিনিধি; তৎকালে বিদেশে



ভারত-প্রচারের ক্ষেত্রে এই দুই মহাকর্মীর সমতুল্য আর কেহই ছিলেন না। ১৮৯৬ থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত স্বামী অভেদানন্দ বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারত-প্রচারের কাজে পাশ্চাত্যদেশে মোতায়েন ছিলেন। এহেন ব্যক্তির নাম বাঙালী জাতির উনবিংশ শতকের ইতিহাসে বাদ দেওয়া ত্রুটি বিশেষ* (৩৭)। বিগত শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকের কাহিনী লিখ্‌তে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারবাদ আর হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ( revivalism ? ) কাহিনী লেখার পরও একটা বড় দিক বাদ পড়ে থাকে, যদি না কঁৎ-প্রচারিত "পজিটিভিজমের" কাহিনী সেই সংগে লিপিবদ্ধ করা হয়। তথাকথিত ব্রাহ্মধর্ম বা হিন্দুধর্ম এই দুইয়ের অনুগামী দল ছাড়াও বাংলাদেশে পজিটিভিজমের দ্বারা প্রভাবিত গোষ্ঠীর আকার-প্রকার তৎকালে নেহাৎ বড় কম ছিল না। দ্বারকানাথ মিত্র থেকে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের যে ঐতিহ্য তা উনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসে এক প্রকাণ্ড আত্মিক শক্তি। এসব ছাড়াও, একটা বিশেষ অর্থে রেণেসাঁস বিষয়ক লেখকদের রচনা এপর্যন্ত অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেছে। তা হলো মূল দৃষ্টিভঙ্গীর। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন যে এক বিরাটতম পুরুষ ও

---

* (৩৭) পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দের কাজকর্মের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য "The Life of the Swami Vivekananda" (Mayabati Edition, 1915, Vols. II, III and IV) গ্রন্থে ধরা আছে। এ বিষয়ে শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য মহাশয় "আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ"-শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে ( "বিশ্ববাণী", ভাদ্র—মাঘ, ১৩৪৮ ) প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩০ সনে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত "Hinduism Invades America" গ্রন্থে লেখক ডক্টর উইণ্ডেল টমাস (Dr. Windel Thomas) আমেরিকায় রামকৃষ্ণ আন্দোলন সম্বন্ধে লিখ্‌তে গিয়ে মন্তব্য করেছেন : "Paying more attention to history and his field of operation, Swami Abhedananda did more than his leader to adjust Vedanta to Western culture. Rather than overpower by flashing oratory, he seeks to convince by sweet reasonableness and a vast array of new and picturesque facts" (p.111),

যুগস্রষ্টা তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। এ নিয়ে পণ্ডিত সমাজে কোনো মত-বিরোধ আছে বলে মনে হয় না ; কিন্তু বাংলার রেণেসাঁস-ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে প্রাক্-রামমোহন যুগের অর্থাৎ ১৭৭৪ থেকে ১৮১৪ সন পর্যন্ত সময়কার ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী পণ্ডিতদের দানও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়।

১৭৭৪ সনে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন, কলিকাতায় "সুপ্রিম কোর্ট" স্থাপিত হয় ও বাঙালী হিন্দুদের কেহ কেহ ইংরেজী ভাষা শিক্ষার দিকে অগ্রসর হন। ঐ ঘটনার এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৭৭৩ সনে ওয়ারেণ হেস্টিংসের আগ্রহে "বিবাদার্ণবসেতু" গ্রন্থ পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত হয়, তৎপরে উহা পারসিক ভাষায় অনূদিত হয় ও সেই পারস্য-অনুবাদ থেকে ইংরেজীতে হ্যালহেডের "Gentoo Code" (১৭৭৪) নামে প্রকাশিত হয়।

অথচ স্বদেশভক্ত, জাতীয়তাবাদী লেখকেরা আজও মোটের উপর ঐ সকল বিদেশীর দান উপেক্ষা করেই চলেছেন, আর অনেকটা সংস্কার বশতই তাঁরা রামমোহনকে বাংলার নবজাগরণের প্রথম অধিনায়ক বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে তথ্যের ও যুক্তির ফাঁক থেকে যায় অনেকখানি।

১৭৮১ সনে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ সনে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় "এশিয়াটিক সোসাইটী"। জোন্স্, উলকিন্স্, কোলব্রুক ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই সকল পণ্ডিতই হিন্দুজাতির প্রাচীন "ক্লাসিক"গুলির পুনরুদ্ধার ও প্রচারের কাজে প্রথম অগ্রসর হন। ১৭৮৫ সনে চার্লস উলকিন্স্ (১৭৫০-১৮৩৬) "ভগবদ্গীতা" ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম *Song Celestial.* এটাই সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রথম উল্লেখযোগ্য ইংরেজী অনুবাদ। ১৭৮৬ সনে উইলিয়াম্ জোন্স্ (১৭৪৬-১৭৯৪) এশিয়াটিক সোসাইটীতে



যে সভাপতির ভাষণ দেন, তাতে উল্লেখ করেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক, কেল্টিক্ ও পারসিক ভাষার উৎস একই। এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দু-তিন বছর পরে জোন্স্ আবার মনু-সংহিতা ( Code of Manu ) ইংরেজীতে তর্জমা করেন। জার্মাণ চিন্তানায়ক নীট্সের উপর মনু-দর্শনের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়।

১৭৮৯ সনে কালিদাসের "শকুন্তলা" জোন্স্ কর্তৃক প্রথমে ইংরেজীতে ও পরে ঐ ইংরেজী অনুবাদ থেকে ফরস্টার (Forster) কর্তৃক জার্মাণ ভাষায় অনূদিত হয় (১৭৯১)। শকুন্তলার ঐ জার্মাণ অনুবাদ-গ্রন্থ সংগে সংগে বিশ্ব-সংস্কৃতির সেবক হার্ডারের (১৭৪৪-১৮০৩) বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই হার্ডারই "শকুন্তলা" বই নিয়ে হাজির করেন গ্যেটের (১৭৫০-১৮৩২) সাম্নে ; গ্যেটে এই বই পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন, আর উক্তি করেছিলেন যদি কেউ বসন্ত ও শরতের, ফুল ও ফলের, স্বর্গ ও পৃথিবীর একত্র সমাবেশ দেখতে চান, তবে তাঁকে পড়তে হবে "শকুন্তলা"। "ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে (১৯৩৭, পৃঃ ১০৮) বিনয় সরকার লিখেছেন : "And Herder introduced it (i.e. German rendering of Sakuntala) to Goethe on whom the effect was as tremendous as that of the discovery of America on geographers and of Neptune on students of astronomy". এই গ্যেটেকেই বিনয়কুমার ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের প্রবর্তক (pioneer) বলে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন আর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই জার্মাণ কবিবর কতখানি শকুন্তলার ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সব আলোচনা বিনয়কুমারের "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" গ্রন্থেও ( লাইপৎসিগ, ১৯২২, পৃঃ ১৪৭-৪৮ ) স্থান পেয়েছে।

১৭৯১ সনে কোলব্রুক কর্তৃক "হিন্দু আইনের সার" (Digest of Hindu Law) ও হ্যামিলটন কর্তৃক "Hedaya" নামক মুসলমান আইন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পর বৎসর বেনারসে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক স্থাপিত হয় সংস্কৃত কলেজ। ১৭৯৫ সনে রাশিয়ান পর্যটক জেরাসিম্ লেবেডেফ্ কলিকাতায় নিউ থিয়েটার বা বেংগল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ও গোলোকনাথ দাসের সহায়তায় ইংরেজী "ডিস্‌গাইস্" (Disguise) নাটক বাংলায় অভিনয় করেন *(৩৮)।

১৭৯৬ সনে টমাস পেনের (১৭৩৭-১৮০৯) "এজ্ অব রিজন্" (Age of Reason)) গ্রন্থ বাহির হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মগত গোঁড়ামির উপর এই বইয়ে তীব্র কষাঘাত মজুত হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাংলাদেশে এই গ্রন্থ এক আলোড়ন সৃষ্টি করে *(৩৯)। প্রসংগত বলা প্রয়োজন যে, ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯এর দশকে ফরাসী দার্শনিক মঁতেস্কিউ (Montesquieu) ও ভলটেয়ার এবং ইংরেজ চিন্তাবীর হিউম ও বেন্থামের চিন্তাধারা বাঙালী ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যাপকদের কাছে এসে পৌঁছাতে থাকে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে (৪ঠা মে) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কলিকাতায় স্থাপিত হয়। উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ সন পর্যন্ত টিকে থাকার পর সরকারী আদেশানুসারে এই কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

* (৩৮) See P. R. Sen's *Western Influence in Bengali Literature*, 2nd edition, 1947, p. 146.

* (৩৯) See Abhedananda's "India and Her People" (নিউইয়র্ক, ১৯০৬, পৃঃ ১৯৭)। হালে "টমাস পেন" নিয়ে গবেষণা করছেন অধ্যাপক অশোক মুস্তাফী। ১৯৫৫ সনে (অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভূমিকা সম্বলিত) "Thomas Paine and India" নামক তাঁর এক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে।



এর পর ১৮০৮ সনে জার্মাণ কবি ও দার্শনিক শ্লেগেল (Schlegel) জার্মাণ ভাষায় "ভারতবাসীদের ভাষা ও জ্ঞান"-বিষয়ক বই ("On the Language and Wisdom of the Indians") প্রকাশ করেন। ইংরেজ পণ্ডিত রলিনসন (Rawlinson) এই প্রসংগে লিখেছেন: "This sudden discovery of a vast literature, which had remained unknown for centuries to the Western world, was the most important event of its kind since the rediscovery of the treasures of Classical Greek literature at the Renaissance, and luckily it coincided with the German Romantic Revival" (Vide: *The Legacy of India*, Oxford, 1937, p. 32).

এর পর ১৮১৩ সনে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারত সরকারের আয় থেকে প্রতি বছর ভারতীয়দের শিক্ষার বাবদ ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই এবিষয়ে ঘটেনি। এর পর বৎসর অর্থাৎ ১৮১৪ সনে রামমোহন রায় স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস সুরু করেন ও জাতীয় উন্নতির জন্য নানাবিধ সংস্কারমূলক কর্মে প্রবৃত্ত হন। বাংলা তথা ভারতের নব-জাগরণের ইতিহাসে ১৮১৪ সন একটি অতি স্মরণীয় বৎসর। এর পর ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুরের ক্রিশ্চান মিশনারীদের দ্বারা "দিগ্‌দর্শন" (Dig-Darshan) নামে বাংলা-ইংরেজী পত্রিকা স্থাপিত হয়।

পূর্বোক্ত ঘটনাপঞ্জী থেকে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, প্রাক্-রামমোহন যুগের ইংরেজ ও জার্মাণ মনীষীদের ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে ও গৌরব-প্রচারে অবদান এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাংলার নবজাগরণের পশ্চাতে এঁদের সাধনা শ্রদ্ধার সংগেই স্মরণীয়। অথচ পরিতাপের বিষয় বাংলার রেণেসাঁস-বিষয়ক গ্রন্থকারেরা আজও রামমোহনের আমল

থেকেই বাংলার নবজাগরণ লিপিবদ্ধ করে থাকেন—প্রাক্-রামমোহন যুগের বিদেশী ভাবুক, নায়ক ও স্রষ্টাদের বড় একটা স্মরণপথে আনেন না। এই হিসাবে তাঁদের গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। বিনয় সরকার এই সব সাধারণ্যে উপেক্ষিত ধারার প্রতিও বহু গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বার বার তাঁর গবেষকদের বলতেন যে "দশাননী দৃষ্টি" দিয়ে অনুসন্ধান চালানো উচিত। তিনি একদিকে ছিলেন কট্টর বস্তুনিষ্ঠ আর একদিকে দশাননী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন চিন্তাবীর। তাই তাঁর গ্রন্থে ও রচনায় বিদেশীরা যত ভারতবাসীর ও বাঙালীর কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েছে আর বাঙালী ও ভারতবাসীরা তাঁর মারফৎ যত বিদেশীকে জানতে পেরেছে, এমন আর একালে অন্য কোনো মানুষের রচনায় পাওয়া যায় না। এখানেও তাঁর বহুত্বনিষ্ঠ মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থে দেশী-বিদেশী যত লোকের চিন্তা ও কর্ম নিয়ে আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একখানি গ্রন্থে তা আর কোথাও নেই।

## লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণা

আজকাল লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণায় বাঙালী পণ্ডিতেরা বিশেষ দরদশীল। ১৯৫০ সনে প্রকাশিত ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস" ও ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষের "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রেও বিনয় সরকারের দান নেহাৎ কম নয়। ১৯০৭ সনের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় "মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি" ও তাঁরই আবহাওয়ায় ঐতিহাসিক গবেষণার ব্যবস্থা কায়েম করেন বিনয় সরকার। মালদহের সহরে ও পল্লীতে প্রতি বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয় শিব-পূজা ও সেই সংগে জনসাধারণের নাচ-গান-বাজনা। এসবের সাধারণ নাম গম্ভীরা। গম্ভীরার পূজা-পার্বণ ও গান-বাজনা "ছত্রিশ



জাতের" সার্বজনিক উৎসব। মালদহের এই গম্ভীরার প্রভাব বিনয়কুমারের জীবন ও যৌবন গঠনে এক প্রকাণ্ড আত্মিক শক্তি। বিনয়কুমার "বৈঠকে" বলেছেন: "গম্ভীরা অমর,—গম্ভীরাই জীবনের আসল বনিয়াদ। জামতল্লীর গম্ভীরাতে যেসব লোকজন দেখেছি সেই সব লোকজনের সংগে তুলনা করেই অন্যান্য লোকজনকে চিনেছি। গম্ভীরার লোকজনের জুড়িদারই পেয়েছি দুনিয়ার নানা পল্লী-শহরে। ১৯০৫-০৭ সনের ব্যক্তিত্বের ভেতর খুবজবরদস্ত্ আধ্যাত্মিক শক্তিই ছিল পুড়াটুলির বারোয়ারি-তলা আর জামতল্লীর গম্ভীরা" * (৪০)। কাজেই মালদহের তরফ থেকে গবেষণার বস্তু হিসাবে গম্ভীরার চেয়ে আর কোনোটাই বিনয়কুমারের দৃষ্টিতে বড় বিবেচিত হয়নি। গম্ভীরার পূজা ও উৎসবের ভেতর তিনি লক্ষ্য করেছিলেন গণ-শক্তির অভিব্যক্তি। কাজেই এই সার্বজনিক গম্ভীরার ইতিহাস লেখাবার আগ্রহে বিনয়কুমার ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে "মালদহ সমাচার" পত্রিকায় পঁচিশ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৯০৮ সনে একটা প্রকাণ্ড রচনা তাঁর হাতে এসে পৌঁছালো। লেখক ডাঃ হরিদাস পালিত। বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধটা ছাপাবার ব্যবস্থা করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৯০৯)। ঐ রচনাই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে "আন্থের গম্ভীরা" নামে গ্রন্থের আকারে বের হয় ১৯১২ সনে। এই বইয়ের মাল-মশলা সামাজিক নৃতত্ত্বের অন্তর্গত। জনসাধারণের জীবন-বিষয়ক তথ্য,—লোক-সাহিত্য, লোক-সংগীত, লোকশিল্প, লোক-নৃত্য, লোক-প্রবাদ, লোকাচার-বিষয়ক তথ্য,—প্রচুর পরিমাণে ঐ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। এইভাবে লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক এক উল্লেখযোগ্য রচনার সংগে বিনয়কুমার স্বদেশীযুগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণায় বিনয়কুমারের যে দরদ তার প্রথম,

* (৪০) বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৪, পৃঃ ৩৭৩-৭৪।

প্রত্যক্ষ আত্মিক উৎস মালদহের গম্ভীরা। দ্বিতীয় প্রেরণা আসে পশ্চিম মুল্লুক থেকে, ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে। ১৯০৮-১০ সনে বিনয়কুমার বেশ কিছুদিন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের লোক-সাহিত্য, লোক-নাট্য, লোক-নৃত্য-বিষয়ক চর্চায় মসগুল ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর পরিচয় ঘটে জার্মাণ চিন্তাবীর হার্ডারের (১৭৪৪-১৮০৩) সংগে *(৪১)। "হার্ডার ছিলেন 'ফোলক্' দর্শনের ঋষি। জনসাধারণের

* (৪১) জাতীয়তাবাদের ঋষি হার্ডারের সম্বন্ধে এদেশে প্রথম বড় আলোচনা করেন বিনয় সরকার। তারপর যে সকল গবেষক হার্ডারের সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাংলায় প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লেখেন, তাঁদের মধ্যে সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল ও মন্মথনাথ সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচনা ১৯৩৯-৪০ সনে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তাঁরা উভয়েই বিনয় সরকারের কাছে ঋণী। প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিনয়কুমার হার্ডারের গুণগ্রাহী হলেও কোনো কোনো বিষয়ে তিনি হার্ডার-পন্থী নন, বরং হার্ডারের একটা বড় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করে থাকেন। ইতালীয়ান মাৎসিনি (১৮০৮-১৮৭২) ও জার্মাণ বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) উনবিংশ শতকে ইয়োরোপের ইতিহাসে জাতীয়তার দুই প্রধান ঋত্বিক। হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) ছিলেন আবার উভয়েরই পূর্বগামী ভাবুক ও চিন্তানায়ক। "হার্ডারের মতে প্রত্যেক জাতির একটা আত্মা বা প্রাণ আছে আর সেই প্রাণ দেখ্‌তে পাই ভাষায়। অতএব তাঁর বয়েৎ,—জাতি-মাফিক রাষ্ট্র, ভাষাহিসাবে রাষ্ট্র, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র। আমার বিবেচনায় রাষ্ট্র একটা কৃত্রিম সঙ্ঘ বা শাসনযন্ত্র। এর ভেতর প্রাণ, আত্মা ইত্যাদি বস্তু দেখবার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানা ভাষা-ভাষী নর-নারী,—হরেক-রকমের সংস্কৃতিওয়ালা নর-নারী,—এক সংগে জীবন চালাতে সমর্থ। এই হিসাবে আমি হার্ডারের এবং হার্ডার-প্রবর্তিত দেশী-বিদেশী চিন্তাধারার উল্টা।" "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (পৃঃ ৭২-৭৩) ও "দি পলিটিক্‌স্ অব বাউণ্ডারিস্" গ্রন্থে (১৯২৬, পৃঃ ১-২৪) উক্ত মত খোদাই করা আছে। হার্ডারের রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণিক আলোচনা বিনয়কুমারের "দি পোলিটিক্যাল্ ফিলজফিজ্ সিন্স্ ১৯০৫" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে (১৯৪২, পৃঃ ২৮৬-২৯৩) ও বিনয়কুমার সম্পাদিত "সমাজ-বিজ্ঞান" গ্রন্থের প্রথম ভাগে (১৯৪০, পৃঃ ৪৭০-৪৮৭) পাওয়া যায়।



আত্মা, জাতিগত চেতনা, জাতীয় চিত্ত ইত্যাদি জিনিষ তিনি দেখতে পেতেন লোক-সাহিত্যে, লোক-শিল্পে, লোকাচারে, লোক-সঙ্গীতে।" "লোক-চর্চা"র বিষয়ে বিনয়কুমার হার্ডারের চিন্তাধারা থেকে কি পরিমাণ প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই "বৈঠকে" স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছেন (বৈঠকে, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭০-৭১)।

"আত্মের গম্ভীরা" প্রকাশিত হবার পর মূলত এই বইয়ের উপর ভিত্তি করে বিনয় সরকার রচনা করেন "দি ফোলক্ এলিমেণ্ট ইন্ হিন্দু কালচার" নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (১৯১৩-১৪)। ১৯১৭ সনে ঐ বই বিলাত থেকে ছাপা হয়ে বাজারে বের হয়। প্রসংগত বলা প্রয়োজন যে,"আত্মের গম্ভীরা"-য় ব্যবহৃত তথ্য ছাড়াও অন্যান্য নতুন নতুন তথ্য ঐ গ্রন্থে ঠাঁই পায়। মালদহের গম্ভীরা ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় প্রচলিত লোক-নৃত্য, লোক-বাদ্য ও লোক-সঙ্গীতের বৃত্তান্তও ঐ গ্রন্থে বর্তমান। তাছাড়া, বিনয় সরকারী ব্যাখ্যা ও সমালোচনাও ঐ ইংরেজী বইয়ের আর এক লক্ষণীয় বিশেষত্ব। এই দুই গ্রন্থ তৎকালে দেশে ও বিদেশে বহু পণ্ডিতকে হিন্দুজাতির বারোয়ারী উৎসব বা লোক-সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে তুলেছিল। "ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় এই বইয়ের সমালোচনা করেছিলেন অধ্যাপক টি. ডবলিউ. রিস্ ডেভিড্‌স (Prof. T. W. Rhys Davids)। বিনয়কুমারের ঐ ইংরেজী গ্রন্থ গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত "ব্রতচারী নৃত্য"-আন্দোলনের পেছনে আংশিক-ভাবে হলেও আত্মিক প্রেরণা যোগায় ("বিনয় সরকারের বৈঠকে", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭)।

লোক-সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা বিনয় সরকারের অন্যান্য বইয়েও অল্পবিস্তর ছড়ানো রয়েছে,—যেমন "ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া" (১৯৩৭, পৃঃ ৩৪৮-৩৫৭), "ইন্‌ট্রোডাকশান টু হিন্দু পজিটিভিজম্" (১৯৩৭), "ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ্ সোশ্যাল প্যাটার্ণস্" (১৯৪১, পৃঃ

১৮৭-১৯২ ), "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ্ সিন্স্ ১৯০৫" ( দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ১৯৪২, পৃঃ ৫৩-৬৫ ) প্রভৃতি গ্রন্থে। বাঙালী জাতির সৃষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভেতর লৌকিক-লোকায়তের স্থান অতি বিপুল ও সুবিস্তৃত। বিনয়কুমারের মতে হিন্দুধর্ম বা আর্য-সংস্কৃতি সেকালের বাঙালীর পক্ষে "বিদেশী মাল"। বাংলার "অনার্য" নরনারী এই বিদেশী 'আর্য' ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বশে এনেছিল* ( ৪২ )। "তথাকথিত আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি অনার্য বাঙালীর প্রভাবে পড়িয়া অনার্যীকৃত হইয়াছে। ইহাকে বলিব অবাঙালী সংস্কৃতির বাঙালীকরণ। হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম অনায়াসে বাঙালীদের জয় করিয়া লইতে পারে নাই। বাঙালী ধর্মের নিকটও ইহাদের মাথা নোয়াইতে হইয়াছে। 'পারিয়া' অর্থাৎ অনার্য বাঙালী বা কাক ও পায়রাজাতীয় নরনারীর সংস্কৃতি ও ধর্মের সংগে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের একটা বোঝাপড়া বা আপোষ, সমঝৌতা বা সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল।... বাঙালীর সৃষ্টিশক্তি ইস্‌লামকেও সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের মতো ইস্‌লামকেও বাঙালীদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রাচীনকালের মতো মধ্যযুগেও বংগ-সংস্কৃতির ভিতর দো-আঁসলা কৃষ্টির আসর গুলজার ছিল। দো-আঁস্‌লামি সনাতন

*(৪২) বর্তমান আলোচনায় 'আর্য' বা 'অনার্য' শব্দ বিনয় সরকার ভাষা-বিষয়ক অর্থে ব্যবহার করেছেন,—শরীরের গড়ন-বিষয়ক অর্থে নয়। আর একটা কথাও এই প্রসংগে বলা প্রয়োজন। কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) এবং সভ্যতা (civilization)এর মধ্যে স্পেংলার ও তাঁর অনুগামী পণ্ডিতেরা সাধারণত যে গভীর পার্থক্য টেনে থাকেন, বিনয় সরকার তা করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বা সভ্যতা একার্থক এবং এদের প্রত্যেকেরই আসল অর্থ সৃষ্টি ( creation )। মানুষের যে-কোনো সৃষ্টিই,—তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্,—সংস্কৃতি বা সভ্যতার নিদর্শন। এবিষয়ে বিনয় সরকারের মতামত ও মতামতের পেছনে যুক্তি "ইণ্ডিয়াজ্ ঈপোক্স্ ইন্ ওয়ার্ল্ড-কালচার" প্রবন্ধে ( প্রবুদ্ধ ভারত, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ ) পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে।



চিজ" ( বৈঠকে, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭১-৫৭২ ও ৫৭৮-৫৭৯ )। অন্যত্র ঐ প্রসংগে বিনয়কুমার বলেছেন যে "অনেকবারই বলা হইয়াছে যে 'অনার্য', আদিম, বুনো, 'পারিয়া', 'কাক-পায়রা', পাহাড়ী ইত্যাদি নরনারীর ধর্ম ও/বা সংস্কৃতি হইল বাঙালীর খাঁটি স্বদেশী ধর্ম ও/বা সংস্কৃতি। এইটাই ভিত্তি বা গোড়ার কথা। তাহার পর সকল যুগেই দেশী-বিদেশীর সম্মেলনে বংগধর্ম ও বংগ-সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশ। বংগ-সংস্কৃতি দো-আঁস্‌লামির বিপুল বিশ্বকোষ। বংগ-সংস্কৃতির বনিয়াদ বলিলে একমাত্র তথাকথিত বংগদেশের ভিতরকার লোকজনের কৃষ্টি বুঝিতে হইবে না। নেপাল, তিব্বত, ভুটান, চীন, ব্রহ্মদেশ, আসাম একদিকে এবং উড়িষ্যা, ছোট-নাগপুর, বিহার অন্যান্য দিকে খাঁটি স্বদেশী পারিয়া বা চিড়িয়া-জাতীয় বাঙালী নরনারীর 'হাড়মাস' এবং সংস্কৃতি জোগাইয়াছে। লৌকিক বা লোকায়ত বংগ-সংস্কৃতির বনিয়াদ বিপুল এবং সুবিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।

"বনিয়াদটা-সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে আলোচনা চলে। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের আচার-ব্যবহারে ও চালচলনে মিল আছে। কারণ কী? সাধারণের ধারণা,—হিন্দুদের কেহ-কেহ মুসলমান হইয়া যাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। কথাটার ভিতর কিছু সত্য আছে; কিন্তু আসল কারণ,—হিন্দুধর্মের মতো মুসলমান-ধর্মেও অনার্য বাঙালী আদিম লোকদের আচার-ব্যবহার আর চালচলন ঢুকিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেই 'বাঙ্‌লামি'-র প্রলেপ পড়িয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর বাঙলার খাঁটি স্বদেশী সংস্কৃতি দিগ্বিজয় চালাইতেছে। এই কথাটা মনে রাখিলে বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানদের রীতিনীতির ভিতর ঐক্য ও সাদৃশ্যগুলা সহজে বুঝিতে পারিব। দুই সংস্কৃতিই 'বাঙালীকরণে'র প্রভাবে অনেকটা একরূপ দেখাইয়া থাকে" ( বৈঠকে, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮০-৫৮১ দ্রষ্টব্য )।

এই বিষয়ে বিনয় সরকারের ইংরেজী প্রবন্ধ "ক্যালকাটা রিভিউ"-তে বাহির হয় ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসে। প্রবন্ধের নাম ছিল "Bengali Culture as a System of Mutual Acculturation" অর্থাৎ 'বংগ-সংস্কৃতির লেন-দেন'। ঐ প্রবন্ধে বাঙালী হিন্দুদের দেব-দেবী,—যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, কালী, চণ্ডী, সরস্বতী, রাধা, মনসা, শীতলা এবং কৃষ্ণ, কার্তিক, গণেশ, দক্ষিণরায় ইত্যাদি—সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে ঐগুলি মোটের উপর বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি। "Durga, Lakshmi, Jagaddhatri, Kali, Chandi, Saraswati, Radha, Manasa, Sitala, and other goddesses worshipped by the Bengali men and women of the diverse castes are virtually unknown in the rest of India except as mere names or metaphors. These goddesses are the Bengali women,—mothers, sisters, wives and daughters,—anthropomorphically and perhaps romantically and idealistically elevated to the dignity of divinities by the Bengali realistic imagination and creative spirit. So are Krishna, Kartic, Ganesh, Dakshina Roy and other gods of the Bengali people nothing but Bengali men,—fathers, brothers, husbands, and sons. It is the boys and girls, the men and women of Bengal, who are adored, lionized, loved and worshipped by the Bengalis in the aesthetic atmosphere of a few songs, chants or hymns in alien Sanskrit, the meaning of which is understood by hardly anybody, very often not even by the priest, in any case, not by more than a few handfuls of



the *intelligentsia*"* (৪৩)। এই সকল মন্তব্যের বাংলা তর্জমা বা মর্মানুবাদ যা "বৈঠকে" সন্নিবিষ্ট আছে, তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি: "বিনয়বাবুর প্রধান কথা,—হাজার-হাজার বছর ধরিয়া বাঙালীদের আসল ধর্ম বাঙালী-ধর্ম—হিন্দুধর্ম নহে। আর নেহাৎ যদি হিন্দু বলিতেই হয়, তবে বলা উচিত যে, উহা বংগ-হিন্দুধর্ম। এই বংগ-হিন্দুধর্ম পাঞ্জাবী, কনোজীয়, তামিল এবং অন্যান্য হিন্দুধর্ম হইতে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা চিজ। দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, কালী, চণ্ডী, সরস্বতী, রাধা, মনসা, বেহুলা, শীতলা এবং অন্যান্য যে-সব দেবতার পূজা বা মানত্ কিংবা পরব্ বাঙলাদেশের বিভিন্ন জাতির বহুসংখ্যক নর-নারী করিতেছে, অন্যান্য প্রদেশে তার কোনো অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। অথবা সেই সকল অবাঙালী পূজার গড়নে আর বাঙালী পূজার গড়নে আকাশ-পাতাল ফারাক। এই সকল দেবীরা আসলে সবাই বাঙালী নারী,—বাঙ্লার ঘরে-ঘরে বিরাজিত মা, বোন, স্ত্রী বা মেয়ে। বাঙালীর বস্তুনিষ্ঠ কল্পনাশক্তি, মানব-প্রীতি ও সৃষ্টি-প্রতিভা এই সকল বাঙালী মেয়েকে দেবীর আসনে বসাইয়াছে। আবার শিব, কৃষ্ণ, কার্তিক, গণেশ, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি দেবতা আসলে বাঙালী পুরুষ ছাড়া আর কিছুই নহে—এরা বাঙালীর প্রতি গৃহের বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলে। বাঙালীরা যখন নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি ও অবোধ্য সংস্কৃত মন্তর আওড়াইয়া এই সকল দেবদেবীর পূজা করে, তখন তাহারা বাঙালী ছেলেমেয়েরই তারিফ্ করে, তাহাদের নিজ হাতে গড়া জিনিষই পূজা করে। লোকায়তের জয়-জয়াকার চলিতেছে বাঙালী সমাজে।

* (৪৩) Vide: B. K. Sarkar's *Political Philosophies Since 1905*, Vol. II, Part III, (Lahore, 1942, pp. 53-65) as well as *Krishnagar College Centenary Commemoration Volume* (Krishnagar, 1948, pp. 17-24).

"বাঙালীর হিন্দুধর্মে লৌকিক-লোকায়তের, বাস্তবের আর মানুষের ও সংসারের স্থান খুব বেশী। ইহা তথাকথিত আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর,—এইরূপ বলা নেহাৎ গা-জুরি মাত্র। কম্-সে-কম্ এইরূপ বলিলে ষোল আনা সত্য বলা হয় না। দেবদেবীগুলি বাঙালীদের নিজস্ব, স্বাধীন সৃষ্টি। এই সবই বাঙালীর বাচ্চা। শক্তি, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও উদ্যমের মূর্তিরূপে অথবা স্রষ্টারূপে এগুলি বাঙালীর মগজ ও হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে। বাঙালীজীবনের অগ্রগতির জন্য বাঙ্‌লার নরনারীকে মজ্‌বুদ ও কর্মঠ করিয়া তুলিবার জন্য এই সকল দেবদেবীর জন্ম। বাঙালী মানবিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল বংগ-হিন্দুধর্ম।

"'মঙ্গল'-সাহিত্য, পাঁচালী, ব্রতকথা ইত্যাদি কাহিনী, গান ও ছড়ার ভিতর বাঙ্‌লার নরনারী পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে মানুষময় করিয়া ছাড়িয়াছে।···বংগ-হিন্দুধর্মের পূজা-পার্বণের আবহাওয়ায় প্রায় ষোল আনাই লৌকিক, অনার্য, পারিয়া, 'বাঙালী'। সংস্কৃতের ছোঁয়াচটুকু বাদ দিলে বংগীয় হিন্দুধর্মে আর্যামির টিকি পর্যন্ত দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। ইহার মুড়ো হইতে পা পর্যন্ত প্রায় সবই 'বাঙ্‌লামি'তে ভরপুর। আর্যামির তোয়াক্কা রাখা বাঙালীর ধাতে সয় না। বাঙালীর বাচ্চা হাড়ে-হাড়ে 'লোকায়ত'। 'লোকায়ত' বা লৌকিক অংশ বাদ দিলে বংগ-সংস্কৃতির প্রায় সব-কিছুই বাদ পড়ে" ("বিনয় সরকারের বৈঠকে", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮২-৮৩ ও ৫৮০)।

বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যের ব্যাখ্যায়ও বিনয় সরকার ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মোটের উপর বয়কট্ করে চলেছেন। তার পরিবর্তে তিনি কায়েম করেছেন বস্তুনিষ্ঠ মানবব্যাখ্যা। হাজার বছরের পুরাণো বাংলা সাহিত্যে যে সকল পণ্ডিত দেব-দেবী ও ধর্মসম্প্রদায়গুলির অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু দেখতে নারাজ, তাঁদের সংগে বিনয় সরকারের প্রথম হতেই আড়ি। বাঙালীর সাহিত্য-বিকাশে ও লোক-



সংস্কৃতির রকমারি গড়নে তিনি বস্তুনিষ্ঠা, সংসারনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়নিষ্ঠা ও মানবনিষ্ঠার প্রেরণা ও পরিচয় পেয়ে থাকেন। তিনি বলেন: "The sex-element is as important a factor in Hindu culture as the folk-element. Instead of starting with the hypothesis of Vaisnava poetry as being the metaphysics or allegory of God and the soul it should be more reasonable to begin with the objective anthropological foundations of daily sex-life among the cowherds, cultivators and other teeming millions" * (৪৪)। হিন্দু-জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই ধরণের ব্যাখ্যা বিনয় সরকার ১৯১৩-১৪ সন থেকেই দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ "ল্যভ্ ইন্ হিন্দু লিটারেচার" (হিন্দু সাহিত্যে প্রেমের কথা, টোকিও, ১৯১৬), "হিন্দু আর্ট ঃ ইটস্ হিউম্যানিজম্ অ্যাণ্ড মডার্ণিজম্" (হিন্দু শিল্প-কলায় মানবনিষ্ঠা ও আধুনিকতা, নিউইয়র্ক, ১৯২০), "এস্‌থেটিক্‌স্ অব ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের সৌন্দর্যতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৯২২), ও অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী সম্পাদিত ইংরেজী "রূপম্" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি (কলিকাতা, ১৯২১-২৭) উল্লেখ করা চলে। এই সকল বইয়ে তিনি হিন্দু সাহিত্যের "প্রেমতত্ত্ব" সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বদলে বলেছেন যে উহা আসলে সাধারণ মানুষের যৌন জীবনেরই অভিব্যক্তি। হিন্দুসাহিত্যের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে এই নয়া ব্যাখ্যা বিনয় সরকারের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ব্যাখ্যারই একটা অংশবিশেষ।

এই সকল আলোচনা থেকে স্বভাবতই বলা চলে যে বংগ-সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায়ও বিনয় সরকার বাঙালী গবেষকদের

* (৪৪) Creative India (Lahore, 1937, p. 356).

অন্যতম প্রধান পথ-প্রদর্শক। ইদানীংকালে যিনি বিনয় সরকারের এই দানের প্রতি পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তিনি হলেন "বাংলার পুরাবৃত্তচর্চা-"র লেখক শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়। উক্ত রচনার এক স্থলে তিনি লিখেছেন (পূর্বাশা, আশ্বিন, ১৩৫৮ বা সেপ্টেম্বর ১৯৫১): "একথাও বলা প্রয়োজন যে, নীহাররঞ্জনই ('বাঙালীর ইতিহাস'-রচয়িতা নীহাররঞ্জন রায়) যে বাংলার ইতিহাসে লোকবৃত্তকে প্রথম গুরুত্ব দান করলেন তা নয়। তাঁর পূর্বেও কেউ কেউ লোকবৃত্তের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। বোধ করি বাংলার লোক-সংস্কৃতির প্রতি প্রথম দৃষ্টি দেন রবীন্দ্রনাথ এবং তারপরে এক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেন বিনয়কুমার সরকার। জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির কথাই যে বাংলার ইতিহাসের আসল কথা, বিনয়কুমারের বহু গ্রন্থেই (যেমন *Folk-Element in Hindu Culture*, ১৯১৭; *Positive Background of Hindu Sociology*, ১৯১৪, দ্বিতীয় সং ১৯৩৭) তা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৯৪৪) তার প্রচুর নিদর্শন আছে (যেমন—৩৬৭-৭২ এবং ৫৬৮-৮৬ পৃষ্ঠায়)।" প্রবোধবাবু আরও দুঃখ করে লিখেছেন যে: "এই গ্রন্থে ('বিনয় সরকারের বৈঠকে') কয়েক বারই নীহার রায়ের উল্লেখ আছে; কিন্তু বাঙালীর ইতিহাসে বিনয়কুমার বা তাঁর কোনো রচনার নাম চোখে পড়ল না।"

## বিনয়কুমারের গদ্য-রীতি

বাংলা ভাষায় ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বিনয় সরকার আর একটি কারণেও স্মরণীয়।



স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-১৯১১) বা তৎপরবর্তী যুগেও বাংলা ভাষায় এই সকল বিদ্যা-সম্বন্ধীয় উচ্চতর আলোচনা বিশেষ প্রায় হতো না—আলোচনার উপযুক্ত ভাষাও অনেক সময় পাওয়া যেতো না। বাংলা ভাষার এই অভাব দূরীকরণের ব্রত বিনয়কুমার সজ্ঞানে গ্রহণ করেন ও প্রয়োজন মত নতুন নতুন শব্দ ও পরিভাষা গঠন করতেও অগ্রসর হন। বাংলা সাহিত্যে একালে যে সকল প্রতিভাবান পুরুষ স্টাইল বা রচনাশৈলী নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, বিনয়কুমার নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। "তাঁহার অভিব্যক্তির ভঙ্গীতে একটি বিশিষ্টতা ছিল। তিনি নিতান্ত সহজ এবং সরলভাবে দুরূহ এবং জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন। বাংলা সাহিত্যে এইভাবে তাঁহার লেখায় একটা 'স্টাইল' গড়িয়া উঠে"* (৪৫)। এই বিষয়ের প্রতি "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম বর্তমান লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিনয় সরকারী 'স্টাইলে'র প্রথম বৈশিষ্ট্য ছোটবহরের বাক্য-রচনার দিকে সুস্পষ্ট ঝোঁক। পাঁচ-সাত লাইন জুড়ে এক-একটা বাক্যের বহর চালাতে তিনি অভ্যস্ত নন। দশ-বারোটা বা তারও কম শব্দে বাক্যগুলিকে পরিপূর্ণ করাই ছিল তাঁর দস্তুর। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি তাঁর গদ্যরীতিতে সাধু শব্দের সংগে গ্রাম্য, মেঠো, চল্‌তি শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগ অর্থাৎ "গুরু-চাণ্ডালি"র সজ্ঞান ব্যবহার করেছেন। এই "গুরু-চাণ্ডালি" ভাষা প্রয়োগের দিক থেকে বিনয়কুমার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গুরুস্থানীয় বিবেচনা করেছেন। তবে গুরু-চাণ্ডালির প্রয়োগে তাঁরা যেখানে মাত্রা টেনেছেন, তারপরেও এই মাত্রা বহুদূর টেনে নিয়ে

* (৪৫) "দেশ" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য—৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪৯

গেছেন প্রমথ চৌধুরী ; আবার প্রমথ চৌধুরী যেখানে থেমেছেন, তারপরেও গুরুচাণ্ডালির মাত্রা টেনেছেন বিনয়কুমার। সাধু বা গুরু-গম্ভীর শব্দের পাশে শুধু হাল্কা বা চল্‌তি শব্দ প্রয়োগ করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি ; তিনি প্রয়োজনমত হিন্দী, উর্দু, ফার্শী ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করতেও সচেষ্ট ছিলেন, আর সেগুলিকে তিনি গেঁথে দিয়েছেন সাধু-চল্‌তি বাংলা শব্দের পাশে। এই রকমারি শব্দ-সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে তাঁর বহু জোরালো বাক্য। ফলতঃ, "বিনয় সরকারী স্টাইল" নামে একটি বিশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যশীল রচনা-কৌশল বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠেছে। "শনিবারের চিঠি"তে শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস একবার লিখেছিলেনঃ "দেশের লোককে কাজে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গি গড়িয়া লইয়াছিলেন, হাত-পা ছুঁড়িয়া অপ্রচলিত ও বিচিত্র শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিজের মনের কথা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিতেন না। এই ভঙ্গি ও ভাষা অনেকের উপহাসের বস্তু হইয়াছে, কিন্তু বিনয়কুমার কখনও দমেন নাই ; তাহার কারণ তিনি মনের মধ্যে কিছুই অস্পষ্ট রাখিতেন না, ফাঁকির সহিত তাঁহার কোনও কারবার ছিল না"* (৪৬)। অর্থাৎ সংক্ষেপে সজনীবাবুর বক্তব্য হলো এই যে, বিনয়কুমারের "অপ্রচলিত ও বিচিত্র শব্দ প্রয়োগ" লেখকের প্রকাশভঙ্গীর একান্ত দুর্বলতা বা সাহিত্যিক অক্ষমতার পরিচায়ক। কথাটা বেহুঁসভাবে লিখে ফেলে শ্রদ্ধেয় সজনীবাবু বড়ই কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন। ভাষাজ্ঞানের অভাব ও দুর্বলতা যাঁদের, তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন নতুন স্টাইলের প্রবর্তন করতে পারেন না—বা এ দুঃসাহসের পথও মাড়ান না। যাঁরা এই দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হন, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ঐতিহাসিক তাঁদের সম্বর্ধনা জানায়। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর এক পত্রে

* (৪৬) শনিবারের চিঠি ( অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬, পৃঃ ২০৮ )।



( কৃষ্ণনগর, ২২।৪।৫৩ ) বর্তমান লেখককে বিনয়কুমার সম্বন্ধে বলেন ঃ "তাঁর আইডিয়া ও প্রকাশভঙ্গী আমায় মুগ্ধ করে দেয়।"

শান্তিনিকেতন কলাভবনের ভূতপূর্ব কিউরেটার ও "ইণ্ডিয়ানা" নামক গ্রন্থপঞ্জী-বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক, কাশীবাসী সতীশচন্দ্র গুহ "বিনয় সরকারের বৈঠকে" ( প্রথম সংস্করণ, ১৯৪২ ) বিনয়কুমার ব্যবহৃত নতুন নতুন শব্দের এক তালিকা প্রস্তুত করে পাঠিয়েছেন। প্রথম থেকে ১০৯ পৃষ্ঠার মধ্যেই শতাধিক নতুন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে সমালোচক উল্লেখ করেন। গুহ মহাশয়ের মতে এর "অনেকগুলিরই প্রথম ব্যবহার বিনয় সরকারের মুখে ও কলমে আসিয়াছে। কবিদের মধ্যে প্রথমে মধুসূদন দত্ত কতকগুলি নতুন শব্দ ও ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছেন ; পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করিয়াছেন। অপরাপর লেখকদের মধ্যে বিনয় সরকার অনেক-কিছু প্রয়োগ করিতেছেন।" এই নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগ ও "গুরু-চাণ্ডালি"র পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় বিনয়কুমার যে সর্বত্র বা সর্বাংশে সফল হয়েছেন, সেকথা কেউ বলবে না ; কিন্তু এই নতুন স্টাইল সংক্রান্ত পরীক্ষায় তিনি যে আবার বহুল পরিমাণে সার্থকভাবে উত্তীর্ণও হতে পেরেছেন, সে-কথাও অস্বীকার করার যো নেই। সম্প্রতি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের গদ্যরীতি সম্বন্ধে কোনো কোনো সমালোচক এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে "চলতি ভাষারীতির অন্যতম প্রধান প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শক্তিশালী গদ্যলেখক, তবে সত্যের খাতিরে মানতেই হবে, তাঁর ভাষারীতিও অতিমাত্রায় ভঙ্গিসর্বস্ব। ভঙ্গি বাদ দিলে বীরবলী গদ্যের বিশেষ কিছু থাকে না। বীরবলী গদ্যের উপর গভীর বিষয়ের ভর কোনদিন সয় নি এবং দেখা গেছে, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে আদর্শ ধরে নিয়ে পরবর্তীকালে যে-সব লেখক আমাদের দেশে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁদের কেউ চিন্তাগাম্ভীর্য আয়ত্ত করতে

পারেন নি''* (৪৭)। কথাগুলির মধ্যে অতিশয়োক্তি দোষ নিশ্চয়ই রয়েছে, তার প্রধান কারণ একসংগে সমালোচক বহু সুধী ব্যক্তি ও সাহিত্য-সাধকের প্রতি ইংগিত করেছেন। তবে প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে সমালোচক যে উক্তি করেছেন, তা মোটের উপর মিথ্যা নয়। বিনয় সরকারের ভাষারীতি বা স্টাইলের বিরুদ্ধে যাঁদের অভিযোগ, তাঁরাও একথা বলতে পারবেন না যে বিনয়কুমারের গদ্যরীতির উপর গভীর ও গুরুগম্ভীর চিন্তার ভর সয় না। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ "বিনয় সরকারের বৈঠকে" নামক গ্রন্থের দুই খণ্ড ( ২য় সংস্করণ, ১৯৪৪-৪৫, পৃঃ ১৫২০ )।

প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিনয় সরকারের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অনেকগুলিই আজ আর সাহিত্যের আসরে অপাংক্তেয় নয়। "আড্ডা", "ওয়াকিব্-হাল", "গোড়াপত্তন", "গড়ন", "তোয়াক্কা", "তারিফ্", "বাঘা বাঘা" ( পণ্ডিত বা ব্যাঙ্ক ), "গণ্ডা গণ্ডা", "নয়া নয়া", "দুনিয়া", "লড়াই", "ইজ্জদ্", "বস্তুনিষ্ঠ", "যুক্তিনিষ্ঠ", "বোধিনিষ্ঠ", "শক্তি-ধর্মী", "হিংসা-ধর্মী" ইত্যাদি শব্দ একালের সাম্প্রতিক সাহিত্যে, সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় রচনায় নজরে পড়ে। এমন কি প্রবীণ সাহিত্যিক গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী মহাশয়কেও দেখি তাঁর রচনায় "বিলকুল বদ্‌লাইয়া গেল", "কসুর করেন নাই" ইত্যাদি শব্দাবলী ব্যবহার করতে। বিনয় সরকারের স্টাইলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে যেটা বড় অভিযোগ তা হলো তিনি বাংলা ভাষার জাত মেরেছেন। প্রবীণ সাহিত্য-রসিক অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেন "অধ্যাপক বিনয়-কুমার সরকার ও বাংলা ভাষা" প্রবন্ধে লিখেছেন: "যাঁরা বাংলা ভাসার আভিজাত্য-রক্ষার পক্ষপাতী, তাঁরা বলেছেন—বিনয়বাবু বাংলা ভাষার জাত মেরে চরম অবিনয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। বিনয়বাবুর তরফ থেকে এ কথার বিনীত উত্তর হচ্ছে এই যে, বাংলা ভাষার

* (৪৭) নারায়ণ চৌধুরী প্রণীত "বাংলার সংস্কৃতি" ( ১৯৫৬, পৃঃ ৪৮-৪৯ ) দ্রষ্টব্য।



জাতটা এতো ঠুন্‌কো নয় যে, এত সহজে তা ভেঙে যাবে। আমি বাংলা ভাষার জাত মারি নি,—বরঞ্চ তার ভেতর নতুন রক্তকণিকার সঞ্চার করে তাকে সুস্থতর ও সবলতর করতে চেয়েছি"* (৪৮)।

## "সংস্কৃতি" ও "সভ্যতা" বিশ্লেষণে বিনয়কুমার

পরিশেষে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। এই রচনায় বহুবারই "সংস্কৃতি" ও "সভ্যতা" পরিভাষা দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইদানীংকালে এই সব শব্দের প্রচলন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায়ই খুব বড় স্থান দখল করে থাকে। অথচ প্রায়ই দেখা যায় সংস্কৃতি বা সভ্যতা ইত্যাদি পরিভাষা সম্বন্ধে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নেই। তাই ঐ পরিভাষাগুলির বিশ্লেষণ এই রচনার পরিশেষে প্রয়োজন বলে মনে করি।

সাধারণত সংস্কৃতি ( culture ) ও সভ্যতা (civilization)—এই দুই শব্দের মধ্যে পণ্ডিতেরা অর্থগত পার্থক্য লক্ষ্য করে থাকেন। মানুষের মননশীলতার পরিচয় যে-সব বস্তুতে মূর্তি লাভ করে, তা হলো সংস্কৃতি, আর শরীরধর্মের প্রয়োজনে মানুষের যে সৃষ্টি তা হলো সভ্যতা। সংস্কৃতির প্রাণশক্তি হলো মানুষের মনে, শরীরধর্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত তাগিদে; কিন্তু সভ্যতার বিকাশ ঘটে স্থূল জগৎ বস্তুতান্ত্রিকতা আশ্রয় করে। জার্মাণ পণ্ডিত অস্‌ওয়াল্ড স্পেংলার (Oswald Spengler) বর্তমানযুগে এই চিন্তাধারার চরমপন্থী প্রতিনিধি। তাঁর মতে সংস্কৃতি (*kultur*) আর সভ্যতা (civilization) মূলগত পৃথক।

* (৪৮) সোনার বাংলা, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯। সেই সংগে কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের "বাংলা সাহিত্যে বিনয়কুমার সরকার" ( প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৫৬ ) প্রবন্ধটি ও বর্তমান লেখকের "দি প্লেস্ অব বিনয় সরকার ইন বেংগলী লিটারেচার" ( মডার্ণ রিভিয়ু, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ ) রচনাটি পঠিতব্য।

সভ্যতার থেকে সংস্কৃতি অনেক উঁচুদরের বস্তু ও অনেক বেশী শাঁসাল মাল। সংস্কৃতির উৎপত্তিস্থল গ্রামে, মানুষের সহজ সরল জীবনে। পক্ষান্তরে, সভ্যতার জন্মস্থান সহরে বা নগরে। স্পেংলারের মতে গ্রাম্য-জীবন সরলতা, হৃদয়ের উৎকর্ষ, চিত্তের বিকাশ, সৃজনীশক্তি ইত্যাদি সদ্বস্তুর সংগে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে, নগর-জীবনে কপটতা, জুয়াচুরি, হৃদয়-হীনতা ও আধ্যাত্মিক অবনতি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ গ্রামের মানুষ আর সহরে মানুষ সম্পূর্ণ পৃথক। স্পেংলারের নিজের ভাষায় "The man of the land and the man of the city are different essences"। গ্রাম্যজীবনে মানুষের সৃষ্টি ও প্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সংস্কৃতি (বা *kultur*-এর) বিকাশ ঘটে; কিন্তু গ্রাম যতই সহরে পরিণত হয়, কৃষক যতই যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায়, ততই ঘটে মানুষের পতন, ততই কমে আসে তার সৃষ্টির উৎকর্ষ, আর সেই সংগে ঘটে তার আধ্যাত্মিক অবনতি—তখন সমাজে দেখা দেয় সভ্যতা (বা civilization)। অর্থাৎ সংস্কৃতির অধঃপতিত অবস্থাটাই হলো সভ্যতা। স্পেংলারের মতে গ্রীস যখন রোমে পরিণত হয়, পল্লী যখন সহরে পরিণত হয়, ফুলটা যখন ফলে পরিণত হয়, তখনই সংস্কৃতি সভ্যতায় পরিণতি লাভ করে। স্পেংলারের বিচারে পল্লী যখন সহরে রূপান্তরিত হয়, তখন সেটা মানুষের বা সমাজের অধঃপতন সূচনা করে। অর্থাৎ সিভিলিজেশান পতনের একটা অবস্থা। এই মতবাদ স্পেংলার খুব জোরের সংগে তাঁর জগৎপ্রসিদ্ধ "দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট" গ্রন্থের দুইখণ্ডে (১৯১৭-২৩) প্রচার করেছেন * (৪৯)।

বিনয় সরকার এই বিষয়ে স্পষ্টত স্পেংলার-বিরোধী। তিনি

* (৪৯) উমা মুখোপাধ্যায় লিখিত "উন্নতি-দর্শনে স্পেংলার, সোরোকিন ও বিনয় সরকার" প্রবন্ধটি ("নববাণী", ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) ও "বিনয় সরকারের বৈঠকে" ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩৬-৭৪০ দ্রষ্টব্য।



সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। তাঁর বিচারে দুই শব্দই একার্থক, আর উভয়েরই অর্থ সৃষ্টি। যে-কোনো সৃষ্টিই তাঁর বিশ্লেষণে,—তা ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বা সভ্যতা; কিন্তু সৃষ্টিকার্য বলে কাকে? "চাষ-আবাদও সৃষ্টি, ছবি আঁকাও সৃষ্টি, লড়াই করাও সৃষ্টি, দলবাঁধাও সৃষ্টি, মন্তর আওড়ানোও সৃষ্টি, গ্যাস-বিষ তৈয়ারী করাও সৃষ্টি।" এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ সৃষ্টি করে কেন? বিনয় সরকার বলেন "পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করিবার আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ার উপর একতিয়ার কায়েম করিবার ইচ্ছা, সংসারে প্রভুত্ব চালাইবার বাসনা,—এই সব ইচ্ছাই সৃষ্টি-কার্যের গোড়ার কথা। একমাত্র ইচ্ছা থাকিলেই কাজ হয় না। চাই শক্তি, চাই ক্ষমতা। মানুষকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা, জগৎকে তাঁবে আনিবার যোগ্যতা, মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার শক্তি,—এই সবও মানুষের সৃষ্টি-কার্যের গোড়ার কথা। সহজে বলা চলে যে, কোনো জিনিষকে উলটাইয়া-পালটাইয়া ভোল বদলাইয়া দেওয়ার নামই সৃষ্টি, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। আধিপত্য করা, কর্তৃত্ব চালানো প্রভৃতি কাজ সংস্কৃতির অংগ,—অংগ শুধু নয়, সংস্কৃতির প্রাণ।...জীবনের বিস্তার, দিগ্বিজয়-সাধন, জগতে আধিপত্য-প্রতিষ্ঠা,—এই সব সংস্কৃতি বা সভ্যতার নামান্তর মাত্র। সু-কু সবই সংস্কৃতি, সৃষ্টি, আত্মপ্রকাশ বা দিগ্বিজয়ের অন্তর্গত। পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিই প্রথমতঃ রূপ নেয় সামরিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ পায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি, আর্থিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থায়"* (৫০)। এই দুটোর মধ্যে আবার কোন্‌টা আগে বা কোন্‌টা পরে তা বর্তমান ক্ষেত্রে বুঝবার প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে বিনয় সরকারের মতামত খুব পরিষ্কারভাবে তাঁর "India's Epochs in

* (৫০) বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৬-৫৬৭।

World-Culture" নামক বক্তৃতা-প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৪১ সনে তিনি নাগপুরে যে একটি সুদীর্ঘ অ-প্রস্তুত বক্তৃতা (extempore speech) প্রদান করেন, তাহা "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় ঐ বৎসরই জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিনয় সরকারের বিশ্লেষণ ও মতামত বুঝ্‌বার সুবিধার জন্য ঐ বক্তৃতা-প্রবন্ধের কিয়দংশ গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট-স্বরূপ সন্নিবেশিত হলো।

---

# পরিশিষ্ট (ক)

## ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস ও স্বরূপ আলোচনায় বিনয় সরকারের দান

( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপক **ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**, এম্. এ., পি. এইচ্. ডি. লিখিত )

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যে সকল ভারতীয় মনীষী দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় ও তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, বিনয় সরকার মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ। বাংলার তথা ভারতের দিকে দিকে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পরাধীনতার ব্যথার তীব্রতা বহু চিন্তাশীল মহাপ্রাণ তখন নিজেরা ত অনুভব করিতেছিলেনই, পরন্তু এই অনুভূতি যাহাতে দেশের জন-সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সে বিষয়েও তাঁহারা বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। বিদেশের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার নানাপ্রকার পন্থা উদ্ভাবনে এই নবজাগরিতের দল আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিজের দেশকে জানিতে, উহার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হইতে ও দেশবাসীকে সচেতন করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। উপনিষদ্‌কার বহু শতাব্দী পূর্বে উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন: 'আত্মানং বিদ্ধি'—'নিজেকে জান'। এই নিজেকে জানার কাজ যে কত কঠিন, তাহা প্রাচীন ঋষিরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এজন্য নানাভাবে তাঁহাদের শিষ্য-সেবক ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে

এ প্রচেষ্টায় জয়ী হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের মনীষিগণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ করিতে হইলে দেশের ও জাতির প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। কারণ ইহা না হইলে অর্জিত স্বাধীনতার স্ফুরণ ও সম্প্রসারণ সম্ভবপর নহে।

বাংলাদেশে এই সময়ে যে দুইটি বিশিষ্ট সংঘ দেশকে জানিবার ও জানাইবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, উহাদের নাম যথাক্রমে Dawn Society এবং National Council of Education. বিনয়বাবু উভয়ের সহিতই উহাদের প্রায় সৃষ্টিকাল হইতেই সংযুক্ত ছিলেন। মালদহের কিশোরকর্মী বিনয়কুমার সসম্মানে উচ্চ শিক্ষার ধাপগুলি অতিক্রম করিয়া তদানীন্তন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিত্ত ও প্রতিপত্তিপূর্ণ পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ইতিহাস ও অর্থনীতির অবৈতনিক অধ্যাপকরূপে Bengal National Collegeএ যোগদান করিলেন ;—তখন উহার অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই বিদ্যায়তনটি National Council of Educationএর সহিত সংযুক্ত ছিল ; কিন্তু অক্লান্তকর্মী দেশহিতব্রত যুবক বিনয়কুমার তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার জন্মভূমি মালদহ জিলায় 'মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সময় হইতেই তাঁহার অন্যান্য নানাবিধ কার্যাবলীর মধ্যে তিনি বাংলাদেশের গণ-সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনকল্পে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের গম্ভীরা অনুষ্ঠান তখন লোক-সংস্কৃতির অন্যতম পরিচায়ক ছিল। বিনয়বাবুর উৎসাহ ও প্রেরণানুযায়ী ইহার ঐতিহ্য ও স্বরূপ অনুসন্ধানকল্পে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি এ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ আহ্বান করেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার



ঘোষণা করেন। হরিদাস পালিতের লেখা প্রবন্ধই পুরস্কৃত হইল এবং বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উহা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত করিলেন। বৎসর তিনেক পরে উহা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে "আদ্যের গম্ভীরা" নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। সে সময়ে বাংলা ভাষায় সামাজিক নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত এরূপ প্রামাণিক গ্রন্থ খুব অল্পই ছিল, এবং ব্রজেন শীল ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ তদানীন্তন বাঙ্গালী মনীষিগণের নিকট ইহা সমধিক আদৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহার মূলে বিনয় সরকারের প্রেরণা বর্তমান ছিল।

"আদ্যের গম্ভীরা" সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের কি প্রয়োজন তাহা এখানে জানানো আবশ্যক। দেশের ও জাতির ইতিহাস রচনার পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অনেকাংশে নবরূপ ধারণ করিয়াছে। ইতিহাস যে কেবল 'রাজা-রাজড়া'র এবং উচ্চস্তরভুক্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনালেখ্য নহে, তাহা এখন পণ্ডিতসমাজে সর্বতোভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনগণের জীবনবেদের বিভিন্ন প্রকাশ, তাহাদের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নানারূপ উৎসব আনন্দের অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যময় রূপ, জাতির ও উহার সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার অন্যতম মূল উপাদান। যে আচার, যে সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আজও এই সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে, তাহার মূল যে বহু শত বা সহস্র বৎসর পূর্বে,—হয় এই দেশের মাটিতে উপ্ত হইয়াছিল নয় বাহিরের পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে,—বিকশিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকবর্গের অন্বেষ্টব্য তথ্য। বিনয় সরকার এ সত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং বাংলাদেশে তিনি যে এই প্রণালীর ইতিহাসচর্চার অন্যতম মার্গপ্রদর্শক এবং পথিকৃৎ তাহা

নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মালদহ তাঁহার জন্মভূমি ও কিশোর বয়সের কর্মক্ষেত্র হইলেও, 'মালদহ জেলার নদী-জঙ্গল-খামার-পুকুর তন্ন তন্ন করিয়া দেখার, তথাকার "ছত্রিশ জাতের" খবর রাখার এবং নানা প্রকারের বাংলা পুঁথি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিব-হাল' হইবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। কারণ যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র কলিকাতা এবং উহার বাহিরে বৃহত্তর জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য তিনি এমন একজন প্রাথমিক অনুসন্ধানকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, যাঁহার এই সকল তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ১৯০৮-১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিনয়বাবু ইয়োরোপীয় লোক-সাহিত্য, লোক-নাট্য, লোক-নৃত্য ইত্যাদির চর্চা করিতেন। এইভাবে তিনি নিজেকে লোক-সংস্কৃতির তুলনামূলক ইতিহাস রচনা করিবার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি "ফোল্‌ক" দর্শনের ঋষি জার্মান-মনীষী হার্ডারের লেখার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। হার্ডার লোক-সাহিত্যে, লোক-শিল্পে, লোকাচারে, লোক-সংগীতে জার্মান জাতির আত্মিক চেতনার ও জনসাধারণের চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। "আত্মের গম্ভীরা" বিনয়বাবুর জন্মভূমির 'লোক-সাহিত্য, লোক-প্রবাদ, লোক-গীতি, লোক-শিল্প, লোকাচার, লোক-নীতি, লোক-নাট্য, লোকনৃত্য' ইত্যাদির প্রামাণিক সংকলন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি ইহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রকৃত চিত্তের স্ফুরণ দেখিতে পান এবং এইরূপে সংগৃহীত দেশী ও বিদেশী তথ্যপুঞ্জের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার ফলে তাঁহার অমর লেখনী-প্রসূত *The Folk Element in Hindu Culture* নামে মূল্যবান্ তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থ লণ্ডন হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেই সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার এই গ্রন্থ "আত্মের গম্ভীরায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী রচনা।" কিন্তু ইহাও ঠিক যে বাংলা বইটির মধ্যে



যে সব তথ্য বর্ত্তমান, তদপেক্ষা অনেক নূতন নূতন তথ্যও তাঁহার এই ইংরাজী গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছিল। উপরন্তু তুলনামূলক আলোচনা, টীকা-টিপ্পনী ও বিশদ সমালোচনা প্রভৃতিও ইহার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিল। যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বা দৃষ্টিকোণ হইতে *Folk Element* গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল, উহা যে পরবর্তীকালের অনেক বাঙ্গালী চিন্তানায়কের চিন্তাধারা ও গবেষণা-পদ্ধতি প্রভাবিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য অংশেও উহার পর সামাজিক নৃতত্ত্বের চর্চা বেশ পুরা মাত্রায় চলিতে থাকে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস ও স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে বিনয় সরকারের অপর একটি বৃহৎ দানের উল্লেখ আবশ্যক। ইহার নাম *The Positive Background of Hindu Sociology*. ইহা প্রথম দুই খণ্ডে এলাহাবাদ হইতে ১৯১৪ এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার আর একটি খণ্ড তথা হইতে মুদ্রিত হয়। ইহার পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ এলাহাবাদের পাণিনি অফিস হইতে মেজর বামনদাস বসু প্রবর্তিত The Sacred Books of the Hindus Seriesএর ৩২তম সংখ্যারূপে নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার প্রথম অংশ,—Introduction to Hindu Positivism,—সম্পূর্ণ নূতন রচনা; ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ,—Hindu Materialism and Natural Sciences এবং Hindu Politics and Economics,—পূর্ববর্তী রচনাগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। তখনকার দেশী ও বিদেশী অনেক পণ্ডিতের মত ছিল যে, ভারতবর্ষ প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকতার দেশ এবং 'ব্যবহারিক বিজ্ঞানে, যুক্তিনিষ্ঠায়, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সমর-বিদ্যায়, বস্তুনিষ্ঠায় একদম আনাড়ি'; এই গ্রন্থ ইহার মূর্ত প্রতিবাদ-স্বরূপ। সরকার মহাশয়ের ভাষাতেই তাঁহার এই গ্রন্থের

মূল প্রতিপাদ্যের পরিচয় প্রদান আবশ্যক বিবেচনা করি। "ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ, ততখানি যুদ্ধপ্রিয়, ততখানি শক্তিযোগী, ততখানি সাম্রাজ্যবাদী যতখানি ইয়োরোপ; ...সাধারণতঃ প্রচার করা হয় যে ভারতবর্ষ অহিংসার দেশ, কিন্তু আমার মতে তার হিংসানীতি জবরদস্ত, এবং যুদ্ধনিষ্ঠা, রাজ্যলিপ্সা ইত্যাদিও অত্যন্ত ভীষণ। ...ভারতের লোকগুলাও রক্তমাংসের মানুষ। ইয়োরামেরিকান আর ভারতীয় পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাজারে যে সকল মত ছড়িয়েছেন, তার অধিকাংশই অনৈতিহাসিক ও যুক্তিবিরোধী। বস্তুনিষ্ঠ নৃতত্ত্বসেবীরা সে সব মত বরদাস্ত করতে পারেন না। ...ভারতের মানুষ সম্বন্ধে অতি প্রচলিত ও অতি লোকপ্রিয় মতগুলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা 'পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড' বইয়ের আসল মুদ্দা।" আমি এই প্রসঙ্গে "বিনয় সরকারের বৈঠকে" নামক গ্রন্থখানির দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রথম ভাগ হইতে (পৃঃ ৩৬-৩৭) এই নাতিদীর্ঘ উক্তিটুকু উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে পরিচয় তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায়ে এই পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারে না।

এই গ্রন্থে বিনয় সরকার ভারতের চিন্তা ও কর্মের বহু শতাব্দীব্যাপী ক্রমবিবর্তনের যে প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্যই মনোজ্ঞ। দেশী ও বিদেশী বহু চিন্তাশীল লেখকের উক্তির এবং নিজের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারত উহার চিন্তায় ও কর্মে কতখানি বস্তুনিষ্ঠ ছিল। সিন্ধুঘাটির প্রাচীনতর বাস্তব সভ্যতা, বৈদিক যুগের ভারতীয় জীবনধারা, বৌদ্ধ-গ্রন্থসমূহে চিত্রিত ভারতীয় সামাজিক জীবন, ধর্ম, নীতি, অর্থ ও কামশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণ্য হিন্দু গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক,



ব্যবহারিক এবং নৈতিক চেতনার বৈচিত্র্যময় রূপ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা তিনি তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। গ্রন্থের নবম, দশম ও একাদশ অধ্যায়গুলিতে কৌটিল্যের যুগ হইতে রামমোহনের কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ আনুমানিক দুই সহস্রাব্দের ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস একটি বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হইয়াছে। সর্বশেষ অধ্যায়টিতে (১২শ) হিন্দু দর্শনশাস্ত্রও যে অংশতঃ বস্তুনিষ্ঠ সে আলোচনাও করা হইয়াছে। এই নব প্রসঙ্গের সম্যক অনুশীলনে গ্রন্থকার তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের ও মননশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি বহু বিদেশী ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি, সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি দেশী ভাষায় তাঁহার অধিকার এবং বাহিরের বৃহত্তর জগতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়—এই সমস্ত গুণই তাঁহাকে তাঁহার মত যুক্তি ও দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

*The Positive Background of Hindu Sociology*র প্রকাশের দুই বৎসর পরে (১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে) চক্রবর্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ কর্তৃক বিনয়বাবুর একাগ্র গবেষণার অন্যতম ফল,—*The Political Institutions and Theories of the Hindus* (A Study in Comparative Politics) নামীয় নাতিবৃহৎ প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা জাগরমান তরুণ এসিয়ার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার প্রথম প্রকাশ জার্মানীর লাইপজিগ সহরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে হয়। Edward Freemanএর *Comparative Politics* গ্রন্থ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপের দেশগুলির সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছিল। বিনয়বাবু আলোচ্যমান গ্রন্থে এই অনুসন্ধান ও গবেষণার ধারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলির

উৎপত্তি ও ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস প্রধানতঃ অধুনা আবিষ্কৃত লেখমালা ও মুদ্রা এবং সমসাময়িক বিবরণীর সাহায্যে এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি এবং 'মহাকাব্য', 'জাতক' প্রভৃতি সাহিত্যগত নিদর্শনসমূহ গ্রন্থকার তাঁহার এই গবেষণায় প্রায় ব্যবহার করেন নাই বলিলেই চলে, কারণ ঐগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে মতবিরোধ বর্তমান। সমসাময়িক নিদর্শনাবলীর সাহায্যে তিনি Bosanquet, Hobhouse প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের সিদ্ধান্ত যে প্রাচীন গ্রীসই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম প্রকাশস্থল, ইহার খণ্ডন করিবার প্রয়াস পান। বিনয়বাবুর এই গ্রন্থ মূলতঃ আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া, আইওয়া, ক্লার্ক এবং কোলাম্বিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তৎ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এই বক্তৃতাগুলির সারাংশ American Political Science Review পত্রিকার ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় "Democratic Ideals and Republican Institutions in India" নামক প্রবন্ধের আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রকাশিত তাঁহার *Positive Background of Hindu Sociology* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "Hindu Achievements in Democracy"রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সব বিষয়ের বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, বিনয়বাবু এতৎ-সম্বন্ধীয় গবেষণাপদ্ধতিতেও অন্যতম মার্গপ্রদর্শক ছিলেন। ১৯২১ এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এতজ্জাতীয় গবেষণার ফল সম্বন্ধে তিনি প্যারিস ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহা অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না যে, বিনয় সরকার প্রমুখ চিন্তাশীল মনীষিগণ ভারতীয় রাষ্ট্রিক চেতনার যে অংশের উপর আলোক-



পাত করিয়া গিয়াছিলেন, উহা পরবর্তীকালে বহু নবীন ও অপেক্ষাকৃত প্রবীণ গবেষকের পথনির্দেশে সাহায্য করিয়াছে।

এ প্রসঙ্গে বিনয়বাবুর এতৎবিষয়ক সুপরিকল্পিত গবেষণা-পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশসমূহের রাষ্ট্র-নৈতিক চেতনা ও গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসের উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি অধিকাংশক্ষেত্রে ইহার আপেক্ষিক আধুনিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এসিয়ায়, তথা ভারতে, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রনীতির যে বিভিন্ন রূপ দেশ, কাল ও পাত্রভেদে প্রকটিত হইয়াছিল, উহার সহিত ইউরোপে বা আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীতে আচরিত রাষ্ট্রনীতির ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানাবলীর সহিত সর্বাঙ্গীন সাদৃশ্য নিরূপণ করা যে কতটা অযৌক্তিক, তাহাও তিনি বিশেষ দৃঢ়তাসহকারে বলিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিৎ প্রাচ্য পণ্ডিতগণের একদলের এতজ্জাতীয় প্রবণতার কথার উল্লেখপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'A class of oriental scholars try to demonstrate the existence of every modern democratic theory and republican institution and perhaps also of Sovietic communism in the experience of ancient and mediaeval Asia' (*Ibid*, p. 9). এই চিন্তাপ্রণালীর অন্তঃসারশূন্যতার সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন; বলা বাহুল্য যে, তাঁহার এই সতর্ক নির্দেশ যদি পরবর্তী কোনও কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গবেষক মানিয়া চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গবেষণা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত রূপ ধারণ করিত। তাঁহার এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার কালে এ জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থ ভারতীয় মনীষিগণের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির আলোচনা ও ব্যাখ্যান বিনয়বাবু তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁহার গ্রন্থে করিয়াছেন। ইহার সূচীপত্রের

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহার অনুশীলন কত অধিক ব্যাপক ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। তিনি তাঁহার গ্রন্থের পুস্তক-পঞ্জীতে যে নানা জাতীয় গ্রন্থাবলীর একটি সুবৃহৎ তালিকা প্রদান করিয়াছেন, উহা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

*The Political Institutions and Theories of the Hindus* গ্রন্থে বিনয়বাবু সমসাময়িক সাহিত্যগত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ব্যতীত অন্যান্য পুঁথিগত উপাদান বিশেষ ব্যবহার করেন নাই একথা পূর্বেই বলিয়াছি; কিন্তু শেষোক্ত উপাদানের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে যে তিনি কার্পণ্য করেন নাই, তাহা আমরা শুক্রনীতি গ্রন্থের তৎকর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ হইতে বুঝিতে পারি। কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্রের মত ইহাও তাঁহার নিকট একটি বিশেষ প্রামাণিক ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইয়াছিল। তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার *Positive Background of Hindu Sociology* গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, 'Like other Niti works the lectures of Professor Sukra to his disciples, the Asuras and Daityas, constitute one of the most important documents of this literature;...its position in it is unique and unparalleled.....It is a handbook of economics, politics, ethics and what not' ( pp. 15-16 ). যাঁহারা শুক্রনীতি গ্রন্থ যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উপরে উদ্ধৃত উক্তিটির যাথার্থ্য ও যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। ইহাতে প্রাচীন ভারতের বার্তাশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি সুশৃঙ্খলতার সহিত বিবরিত ত হইয়াছেই, উপরন্তু ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব, স্থাপত্য-বিজ্ঞান এবং শিল্পশাস্ত্রাদিও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চেতনা যে শুক্রনীতিতে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট



হইয়াছিল, তাহা বিনয়বাবু উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং এজন্যই তিনি ইহাকে তাঁহার অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বর্গত বিনয় সরকার মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও কর্মময় জীবনের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয় নহে, এবং এত অল্প পরিসরে ইহা সম্ভবও নয়। আমি কেবল ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস ও স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্ট দানের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি জানি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিনয়বাবুর যে গভীর জ্ঞান এবং যথার্থ ধারণা তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, আমি উহার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

কলিকাতা
৪।৫।৫৭

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

# পরিশিষ্ট (খ)

## Culture or Creation as Domination

BY

**Benoy Kumar Sarkar**

There are academicians, philosophers and publicists, both in East and West, who cannot feel happy unless they make a distinction between culture and civilization. I am not one of them. In my vocabulary culture and civilization are identical terms. The distinction is generally made in Germany where Kultur is taken to be more profound, more creative and more substantial than civilization. In France, as a rule, scientists and *less hommes des lettres* fight shy of the word 'culture'. To them the sweetest word is *la civilisation francaise*. Italians are like the French in this respect. Italy does not care for *la coltura* so much as for *la civilizzazione*. In English thought the custom continues to be more or less French, although the German term and ideology were introduced by Mathew Arnold among others. American intellectuals have not gone in definitely for one way or the other. They use culture and civilization indifferently. Those contemporary Eur-American sociologists or philosophers who want to exhibit their up-to-dateness in German vocabulary, especially the ideologies propagated by Spengler, have to refer to the distinctions observed in Germany by way of preliminary observations. But they virtually ignore them as they proceed unless they happen to be exponents of the Spenglerian or some allied thesis.



To me culture or civilization is nothing but my Sanskrit or virtually all-Indian *Krishti*, *Samskriti* or *Sabhyata*. It is a synonym for the creations of man, whatever they are, good, bad or indifferent. I do not attach any moral significance to the word. My culture or civilization is entirely unmoral, carrying no appraisal of values, high or low. I take it as a term describing the results of human creativity. It is desirable to be clear about it at the very outset. Most probably the ideas of most of you are radically different from mine.

Any creation of man being culture, the most important item in it is the force behind culture, the culture-making agency, the factor that produces or manufactures culture. The analysis of culture or civilization is nothing but the analysis of man's creative urges, energies or forces. It is the will that creates, it is the intelligence that creates, and perhaps likewise it is the emotion that creates. The first thing that counts in the human personality, in the individual or group psyche is the desire to create. And the second thing certainly is the power to create. In culture or world-culture I am interested in this desire of man and this power of man to create.

It is the nature of human creativity to be endowed with interhuman impacts, good or bad. Social influence is to be postulated of creation as such. Every

creation exerts automatically an influence upon the neighbourhood. The influence may be beneficial or harmful. The creation is perhaps only the production of a food plant, a cave-dwelling, an earthen pot, a song or a story. But the creator influences the neighbour as a matter of course. His work evokes the sympathy or antipathy of the men and women at hand or far off. It thus dominates the village, the country and the world, be the manner or effect of domination evil or good. Creation is essentially domination. To create is to conquer, to dominate. No domination, no creativity.

The desire and the power to dominate is then the fundamental future in every creative activity, in every expression of culture. In every culture we encounter the desire to dominate and the power to dominate. The quality, quantity and variety of men and women who have the desire and the power to dominate set the limits of the culture-making force in a particular region or race. In order to be able to make a culture or possess an epoch in world-culture a region or race must have a large number of varied men and women effectively endowed with this desire and power to dominate.

The term 'world' in world-culture is not to be taken too literally so as to encompass all the four quarters of the universe and all the two billions of human beings. The smallest environment of an individual is his world. As soon as he has created something his culture has influenced the neighbour. It may then be



said already to have conquered the world and made or started an epoch. It is clear that the words, conquest and domination, are not being used in any terroristic terrifying or tyrannical sense. There is nothing sinister in these words, nothing more sinister at any rate than in the words, influence or conversion.

Once in a while, or very often, it may so happen that while your creation or culture is influencing, converting, conquering or dominating your neighbour, his creation or culture is likewise at the same time influencing, converting and dominating you. This sort of mutual influence, mutual conversion, reciprocal conquest or reciprocal domination is a frequent, nay, an invariable phenomenon in inter-human contacts. Hardly any religious conversion of a large group in the world's history has heen one-sided. It has as a rule led to a give-and-take between two systems of cult. Acculturation or the acceptance and assimilation of one culture by a region or race of another culture furnishes innumerable instances of this mutuality in domination or reciprocity in conquest. But that the essential item in future is influence, conversion, conquest or domination is however never to be lost sight of*.

---

* "প্রবুদ্ধ ভারতে" (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ সনে) প্রকাশিত বিনয় সরকারের বক্তৃতা-প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ও

কালিদাস মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

# ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ

( ডাঃ মজুমদার, ডাঃ সেন ও বিরুদ্ধপন্থীদের
আলোচনার সমালোচনা )

পরিশিষ্ট ঃ

## ১৮৫৭-র বিদ্রোহে জনতার অংশ

( উমা মুখোপাধ্যায় )

মূল্য ঃ এক টাকা

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ও

উমা মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

## ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান (১৯০৬-১৯০৮)

( ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সম্বলিত )

[ যন্ত্রস্থ ]

৯২৯ বিনয়
হরিদাস
(OR)

## বিনয় সরকারের বৈ

( বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্ক

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ : মূল্য বারো

**Indian P. E. N.** ( Bombay ) : "Mr. Mukherjee deserves to be congratulated for having brought out the ideas and ideologies of Prof. Sarkar in a convenient and readable form. The reader is struck by the originality and forcefulness of the views expressed by Prof. Sarkar" ( N. Das ).

●

## বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী

১৬৬ পৃষ্ঠা : মূল্য দুই টাকা

**Hindusthan Standard** (23.6.1946) : "Much of what Mr. Mukherjee says is thought-provoking and provocative also. His readers will certainly range themselves into two hostile camps of warm advocates and bitter critics. But that is perhaps the merit of the volume which compresses within a small compass so many stimulating ideas" ( Saroj Acharya ).

**অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার** : "হরিদাস মুখোপাধ্যায়কে এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র হিসাবে জানতাম। তিনি যে সুলেখক ও গবেষণায় সিদ্ধহস্ত, সম্প্রতি তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি" ( ৮.৭.৪৬ )।

**বিনয় সরকার** : "এত ছোট বহরে এমন শাঁসাল বই বাঙালীর হাতে বেশী বাহির হয় নাই" ( ৮.৯.৪৫ )।